



মাসিক

আলোকধারা

রেজিঃ নং-২৭২

২৩ তম বর্ষ

১ম সংখ্যা

জানুয়ারি ২০১৭ ঈসাব্দী

তাসাওউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

পবিত্র ফাতিহা-ই ইয়াজদাহুম ও
মহান ১০ মাঘ উরস শরিফ



শুভ হোক ২০১৭



গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ (১০ পৌষ ১৪২৩) বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী (কঃ) এর ৮৮তম খোশরোজ শরিফ উপলক্ষে গাউসিয়া হক মন্জিল শান্তিকুন্জ ময়দানে মাইজভাগুরী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পর্ষদ আয়োজিত মাহফিলে ভক্ত জায়েরীন ও মুরিদানদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন সাজ্জাদানশীন রাহবারে আলম হযরত আলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাগুরী (মা.জি.আ.)।



গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৬ নগরীর বিবিরহাটস্থ এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট মিলনায়তনে মাইজভাগুরী একাডেমি আয়োজিত 'ইসলামী মূল্যবোধ ও আধুনিকতা' শীর্ষক মাসিক রুহানী সংলাপে বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আরবি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্।



এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট আয়োজিত মহিলাদের মাসিক আত্মজিজ্ঞাসামূলক অনুষ্ঠান 'আলোর পথে'র ডিসেম্বর ২০১৬ পর্বে 'পবিত্র কুরআনে আলোকে ঈদ-ই মিলাদুননী (দঃ)' বিষয়ে আলোচনা করছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক মাওলানা মোহাম্মদ শায়েস্তা খান আজহারী।

মাসিক

আলোকধারা

THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
TASAWWUF STUDIES

রেজি. নং ২৭২, ২৩তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

জানুয়ারি ২০১৭ ঈসায়ী
রবিউল আউয়াল-রবিউস সানি ১৪৩৮ হিজরি
পৌষ-মাঘ ১৪২৩ বাংলা

প্রকাশক

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

যোগাযোগ:

লেখা সংক্রান্ত: ০১৮১৮ ৭৪৯০৭৬

০১৭১৬ ৩৮৫০৫২

মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্ত: ০১৮১৯ ৩৮০৮৫০

০১৭১১ ৩৩৫৬৯১

মূল্য : ১৫ টাকা

US \$=2

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:

দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স

সৈয়দ সলিমুল্লাহ শাহ্ রোড, বিবিরহাট

পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১। ফোন: ২৫৮৪৩২৫



শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট-এর একটি প্রকাশনা

Web: www.sufimaizbhandari.org

E-mail: sufialokdhara@gmail.com

সূচী

- সম্পাদকীয়:
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি কুরআনের হাতছানি-----২
- সন্দর্ভ তফসীর : সূরা আল বাক্বারাহ শরীফ (পর্ব-৪/ক)
অধ্যক্ষ আল্‌হাজ্জ মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী
-----৩
- অলিকুলের চির মহাবিস্ময় হযরত বড় পীর গাউসুল আযম সৈয়দ
আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী-----৬
- গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গ
জহুরুল আলম-----৯
- সুন্নাহ-ভিত্তিক ইসলামে তাসাওউফের স্থান
মূল: শায়খ নূহ হা মিম কেলার
অনুবাদ: কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন-----১৪
- উসূলে সাবআ এবং “মাইজভাণ্ডারী তরিকা”র স্বরূপ উন্মোচন : একটি
পর্যালোচনা-----১৭
- তাওহীদের সূর্য : মাইজভাণ্ডার শরীফ এবং বেলায়তে মোতলাকার উৎস সন্ধানে
জাবেদ বিন আলম-----২১
- শ্রেষ্ঠ নবী’র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শ্রেষ্ঠ মু’জিয়া
ইউসূফ মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন শাহ্-----২৭
- ওয়াসীলা গ্রহণ : একটি ইসলামী বিধান
মাওলানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ-----৩১
- তাসাওউফ তত্ত্বে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব
মোহাম্মদ শায়েস্তা খান-----৩৩
- সুফিবাদে ‘ইশ্ক’ শব্দের প্রয়োগ ও চর্চা
অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান-----৩৫
- ধর্মের দাবীর সাথে নৈতিকতার ব্যবধান
এস এম সেলিম উল্লাহ-----৩৭
- ইসলামের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান
ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান-----৩৯
- শিশুদ্যলোক : সাবধানীরা থাকবে ঝরনা ভরা জান্নাতে
মো. তাজুল ইসলাম রাজু-----৪১
- রাষ্ট্রীয় সফরে মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী মিশরে
অধ্যাপক এ.ওয়াই.এম.জাফর-----৪৩
- মুর্শীদের খোঁজে
শেখ আবুল বসার-----৪৫
- জায়নামায কর্ণার-----৪৬
- সোনালী অতীতের কুশলী নির্মাতা-----৪৭
- আলোকধারা তথ্যভাণ্ডার-----৪৮

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি কুরআনের হাতছানি

ঈসায়ী নববর্ষ শুরু হয়েছে। কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে ২০১৬ সাল। বসন্ত বিদায়ী বছরের ৩১ ডিসেম্বর আর নতুন বছরের ১ জানুয়ারির মাঝে রূপগত, গুণগত ও প্রকৃতিগত তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু তবুও নতুন একটি বছরের আগমনে মানুষ পুলকিত হয়। তারা আশা করে নতুন বছরে নব উদ্যমে সবকিছু শুরু হবে আবার। জড়তা, হতাশা, গ্লানি সব কেটে যাবে, নতুন সূর্যোদয়ের মত নতুন করে হেসে উঠবে জীবন। হয়তো পূর্ণ হবে অন্তর্গত আশা, বাস্তবায়ন হবে অন্তরঙ্গ কামনা। হয়তো এসে ধরা দেবে সাফল্যের স্বর্ণ ঈগল। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে সাফল্য নিজে থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কখনো আমাদের দুয়ারে হাজির হবে না যদি না তার জন্য আমরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করি। আমাদের জীবনে অনেক আনন্দ বেদনা, সফলতা ব্যর্থতা, তৃপ্তি ও গ্লানি পাশাপাশি বিরাজ করে। এতদসত্ত্বেও আমরা জীবন সম্পর্কে আশাবাদী থাকি। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব মানুষকে জীবন পথে চলার সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি নানাভাবে আশার বাণী শুনিচ্ছে। সুরা আদদোহায় বলা হয়েছে: **অতীতের চেয়ে নিশ্চয়ই ভবিষ্যত ভালো হবে। (৯৩:৪)** বলা বাহুল্য, পবিত্র কুরআনের উচ্চারণ কোনো ফাঁকা বুলি নয়। যে বা যারা কুরআনের বাণীতে আশ্বস্ত থাকবে না সে বা তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ কুরআনই মহাকালের শপথ নিয়ে আমাদের জানিয়েছে বেশিরভাগ মানুষই ক্ষতির মাঝে নিপতিত। মানুষ বলে থাকে, গেল দিন ভালো, আসছে দিন খারাপ। এ বোধ কুরআনী জীবন দর্শনের বিপরীত। কেন মানুষ বর্তমানের চেয়ে অতীতের দিনগুলোকে মধুর মনে করে? কারণ জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ সবকিছুকে সরল ভাবে গ্রহণ করে ও একটি আনন্দময় পরিবেশ ও কল্যাণময় দিককে রক্ষা করে চলে। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার চিন্তাধারায় জটিলতা উপস্থিত হয়, ক্রমশ সহজ সরল দৃষ্টিভঙ্গিকে সে পরিবর্তন করে বক্র দৃষ্টিতে। মানুষ যেহেতু পরিবেশের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয় তাই একের কর্মের প্রতিক্রিয়ায় সেও তার আচরণকে বদলে ফেলে। ফলে বর্তমানকে তার কাছে অধিকতর জটিল মনে হয়। কিন্তু মানুষকে আশার বাণী শোনানোর পর আল্লাহ অতীতের চেয়ে ভালো ভবিষ্যত নির্মাণের জন্য কিছু দায়িত্ব পালনের নির্দেশও দিয়েছেন। একই সূরার শেষ তিন আয়াতে বলা হয়েছে: **ইয়াতীমের প্রতি কঠোর না হতে, কোনো সাহায্যপ্রার্থীকে ভর্ৎসনা না করতে আর স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহের কথা ঘোষণা করে দিতে। (৯৩: ৯,১০,১১)** সমাজে ইয়াতীম হচ্ছে সবচেয়ে অসহায়। শুধু মাতাপিতা হারিয়ে মানুষ ইয়াতীম হয় না, বিত্ত বৈভব, শিক্ষা, নীতি নৈতিকতা, রুচিবোধ হারিয়েও

মানুষ ইয়াতীম হয়ে পড়ে। সে অবস্থায় ব্যক্তি ও সমষ্টিগত পর্যায়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো মানুষেরই দায়িত্ব। কিছু অর্থ লাভের প্রত্যাশায় উনুখ থাকা মানুষই শুধু সাহায্যপ্রার্থী নয়। বরং মানুষ সাহায্যপ্রার্থী হতে পারে সুবিচারের আকাঙ্ক্ষায়, ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে, অন্যায়কে প্রতিরোধের আয়োজনে, নিজের কিংবা অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার তাড়নায় কিংবা বিপদগ্রস্ত হয়ে দিক নির্দেশনার আশায়। আর আল্লাহর মহিমা প্রকাশের জন্য মানুষকে জীবনের সর্বাবস্থায় প্রস্তুত থাকতে হবে। এ মহিমা প্রকাশের ধরণ শুধু আল্লাহর গুণগান প্রকাশের মাধ্যমে নয় বরং তাঁর প্রতিটি নির্দেশ ও অভিপ্রায়কে পালন ও তাঁর বাণীকে সকল মানুষের মাঝে প্রচার করাও জরুরি। বসন্ত আল্লাহর মহিমা যথাযথভাবে প্রকাশ পেলে মানুষ কখনো অন্যায়, অবিচার, ব্যভিচার, উন্মাদনা, সন্ত্রাস, লুণ্ঠন, জুলুমের শিকার হবে না এবং কাউকে এসবের শিকার বানাতে না। এ দায়িত্ব শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে নয়, বরং সামাজিক, জাতীয়, রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও পালন করা প্রয়োজন। তাহলেই কুরআনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের ভবিষ্যত তার অতীতের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। পৃথিবীতে যুগে যুগে প্রেরিত নবী রাসূলেরা (তাঁদের সবার প্রতি বর্ষিত হোক আল্লাহর অশেষ করুণাধারা, রহমত ও শান্তি) এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী অলি বুজুর্গগণ মানুষকে শুধু তাদের এ দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সচেতন করে তুলেছেন। পবিত্র রবিউস সানি মাসের ১১ তারিখ পালিত হবে ফাতেহা-ই-ইয়াজ দাছম। হযরত পীরানে পীর গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) আজীবন মানুষকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে ডেকেছেন। উপমহাদেশের অধ্যাত্ম শরাফতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত গাউসুল আ'যম মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী (ক.সি.আ) তাঁর অসংখ্য কালামের মধ্যে মানুষকে পরিবার পরিজন নিয়ে আল্লাহর জিকির তথা মহিমা প্রকাশের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এ মাসেরই ২৩ জানুয়ারি (১০ মাঘ) এ মহান সাধকের পবিত্র উরস শরিফ। যা নিকট ও দূরবর্তী জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের এক মহা মিলন মেলাও বটে। ২০১৭ সালের আগমনের সাথে সাথে মাসিক আলোকধারাও তার প্রকাশনার ২৩তম বর্ষে পদার্পন করছে। এ সুযোগে আমরা আলোকধারার সকল পাঠক পাঠিকা, লেখক লেখিকা, শুভানুধ্যায়ী এবং হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাগুরী (ক.সি.আ) এর অনুসারী ভক্ত অনুরক্ত সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমরা আলোকধারা প্রকাশনাসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর সাহায্য ও রহমত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের করুণা ও সুপারিশ এবং আল্লাহর প্রিয় অলিয়ে কেরামের রুহানী ফয়েজ ও বরকত কামনা করি।

সন্দর্ভ তফসীর : সূরা আল-বাক্বারা শরীফ (পর্ব-৪/ক)

• অধ্যক্ষ আল্‌হাজ্জ মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী •

বিশিষ্ট লিখক ও গবেষক অধ্যক্ষ আল্‌হাজ্জ মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক প্রণীত তাফসীর-এ-সূরা ফাতিহা শরীফ মাসিক আলোকধারায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে পর্বে পর্বে ক্রমশঃ সূরা আল বাক্বারা শরীফের তাফসীর প্রকাশ করা হচ্ছে।

আলহাম্‌দু ওয়াস্‌সানাউ ওয়াশ্‌শুকরু লিল্লাহিল্লাজী নাওয়রানা বিনূরিল ঈমান, ওয়া আফ্‌দালুস্‌সালাতু ওয়া আয্‌কাছ্‌লামু ওয়া আহ্‌ছানুত্তাহ্‌ইয়াতু আলা মান খাস্‌সাহ্‌ বিল্‌ কুরআন, আল্লাজী লাইছা লাহ্‌ নজীরুন ওয়া লা মিচালুন ওয়া লা চান। ওয়া আলা আলিহী ওয়া আহ্‌লি বাইতিহী ওয়া আস্‌হাবিহিল্লাজীনা ক্বামু বিল্‌ ফুরক্বান, ওয়া আলা আতিক্বাহিল্লাজীনা তাবিয়ুহুম বিল্‌ ইহ্‌সান, বিল্‌ খসুসি আলা গাউসুল আযম আশ্‌শাহ্‌ আস্‌সূফী আস্‌সৈয়দ আহ্‌মাদুল্লাহ্‌ আল্‌-মাইজভাণ্ডারী ওয়া গাউসুল আযম বিল্‌ বিরাসত বাবাভাণ্ডারী আশ্‌শাহ্‌ আস্‌সূফী আস্‌সৈয়দ গোলামুর রহমান, ওয়া আলা আওলাদিহীম ওয়া আহ্‌লি তুরীক্বাতিহীমুল্লাজীনা ছাবাক্বানা বিল্‌ ঈমান। আম্মাবাদ।

প্রধান প্রধান কিতাব নাজিল হওয়ার তারিখ: প্রধান প্রধান কিতাবগুলো অবতরণ করার ক্ষেত্রে আল্লাহপাক পবিত্র রমজান মাসকেই ধার্য করেন। এমাসটি আল্লাহ তা'য়ালার ওহী এবং আসমানী কিতাব নাযিল করার জন্য নির্বাচিত করেছেন। কুরআনে করিম প্রথম এমাসেই অবতীর্ণ হয়েছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালাম এর সহীফা নাযিল হয়েছিল রমদ্বান মাসের ১ম তারিখে, রমদ্বানের ৬ তারিখে তওরাত, ১৩ তারিখে ইঞ্জিল এবং ২৪ তারিখে কুরআন-এ-করিম নাযিল হয়েছে। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'য়লা আনহু এর বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, 'যুবুর' কিতাব রমদ্বানের ১২ তারিখে এবং ইঞ্জিল ১৮ তারিখে নাযিল হয়েছে। (সূত্র-ইবনে কাছীর)

নামায-রোজা দিবা যামির অনুবর্তী: যে সব দেশে রাত ও দিন কয়েকমাস দীর্ঘ হয়ে থাকে, সে সব দেশে বাহ্যতঃ মাসের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায় না; অর্থাৎ রমদ্বান মাসের প্রকাশ্য আগমন ঘটে না। কাজেই সে দেশের অধিবাসীদের উপর রোজা ফরজ না হওয়াই উচিত। হানাফী মাযহাব অবলম্বী ফিকহবিদগণের মধ্যে হালওয়ানী, কিবালী রাহমাতুল্লাহি তা'য়লা আলাইহি প্রমুখ নামাযের ব্যাপারেও এমনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ফতোয়া দিয়েছেন যে, তাদের উপর নিজেদের দিন-রাত অনুযায়ী নামাযের হুকুম বর্তাবে। অর্থাৎ যে দেশে মাগরিবের সাথে সাথেই সুবহে সাদেক হয়ে যায়, সে দেশে ঈশার নামায ফরজ হয় না-(সূত্র : ফতোয়ায়ে শামী) প্রসংগত উল্লেখ্য যে, যে দেশে ছয় মাসের দিন হয়

সেখানে শুধু পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরজ হবে। রমজান আদৌ আসবে না।

একটি দ্বন্দ্ব নিরসন: বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে আরবের সাথে তাল মিলিয়ে সে দেশের সময়ানুসারে রোজা পালন, ঈদ উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। তাতে বাংলাদেশের সময়ানুযায়ী যেদিন রোজা রাখা হারাম সেদিন রোজা পালন করা হয় আবার যেদিন রোজা ভঙ্গ করা হারাম সেদিন রোজা ভঙ্গ করা হয়ে থাকে। বিষয়টি Sensitive বা স্পর্শকাতর। ইসলাম ধর্মে জটিলতার স্থান নাই, বলা হয়েছে- “আদীনু ইউছরুন লাইছা বিউছরিন,” অর্থাৎ ধর্মে কোন কাঠিন্যতা নেই, ধর্ম হলো সহজ পন্থা। আল্লাহপাক বলেন “লা ইকরাহা ফিদীন” অর্থাৎ ধর্মে কোন অপছন্দনীয়তা নাই। ধর্মের অপব্যখ্যা করা থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক জ্ঞানী-গুণীর কর্তব্য। আল্লাহ পাক সে তওফিক আমাদেরকে দান করুন।

নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া: জান্নাতের মধ্যে হযরত বাবা আদম আলাইহিস্‌সালাম বুঝে-গুনে ইচ্ছাকৃত ভাবে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে গনদুম বৃক্ষ হতে গনদুম খাননি বরং তাঁর দ্বারা ভুল হয়ে গিয়েছিল বা ইজতেহাদগত বিচ্যুতি ঘটেছিল যা প্রকৃতপক্ষে কোন পাপ নয়। কিন্তু হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামের শানে-নবুয়ত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চ-মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিচ্যুতিকেও যথেষ্ট বড় মনে করা হয়েছিল। আর কুরআন মজিদ সে জন্যই একে পাপ বলে অভিহিত করেছে। অবশ্য আদম আলাইহিস্‌সালাম এর তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পর তা মাফ করে দেয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সূরা-আল বাক্বারাহার ৩৬নং আয়াতংশে বলা হয়েছে “ফাআযাল্লাহ্‌মাশ্‌ শাইত্বানু য়ানহা ফা আখরাজাহ্‌মা” অর্থাৎ- অতঃপর শয়তান উভয়কে পদস্থলিত করে দেয়। হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামের জন্য নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করাটা বাহ্যিকভাবে পাপ বলে দৃশ্যমান হলেও নবীগণ পাপ থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র। আহলে সূনাত ওয়াল জামাতের আক্বীদার অন্তরভুক্ত বিষয় হলো “আল আম্বিয়াউ মাসুমুন” অর্থাৎ- নবীগণ নিষ্পাপ।

আদম আলাইহিস্‌সালাম, হাওয়া আলাইহিস্‌সালাম ও শয়তানের কাহিনী: সুলতানুল মাশায়েখ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া মাহবুবে ইলাহী কাদাসাল্লাহু সিররাহুল আজিজ ইরশাদ করেন যে, খান্নাস হলো একটি দৈত্য। যে আদম সন্তানের অন্তরের উপর অবস্থান করে। যখন মানুষ আল্লাহর জিকিরের মধ্যে মশগুল হয় তখন ওয়াসওয়াসাকে

বিদূরীত করে দেয়। তিনি আরো বলেন, মাওলানা আলাউদ্দীন তরমুজী তদীয় কিতাব নওয়ারেদুল উসুল এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, একদা মা হাওয়া আলাইহাস্‌সালাম একাকী বসেছিলেন, শয়তান তার সাথে খান্নাসকে নিয়ে মা হাওয়া আলাইহাস্‌সালাম এর নিকট আসল এবং মা হাওয়া আলাইহাস্‌সালামকে বলতে লাগল যে, এটি আমার সন্তান, একে আপনার পাশে রাখেন। একথা বলে শয়তান চলে গেল। যখন বাবা আদম আলাইহিস্‌সালাম আসলেন এবং হাওয়া আলাইহাস্‌সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এটা কে? তখন হাওয়া আলাইহাস্‌সালাম বললেন যে, শয়তান তাকে আমার নিকট নিয়ে এসেছিল এবং বলছিল যে, এটি আমার সন্তান; তাকে আপনার পাশে দেখে রাখবেন। তখন একথা শুনে হযরত আদম আলাইহিস্‌সালাম বললেন, তুমি তার কথা গ্রাহ্যই বা করলে কেন? সে তো আমাদের শত্রু। অতঃপর আদম আলাইহিস্‌সালাম উক্ত খান্নাসকে চার টুকরা করে দিলেন এবং টুকরোগুলো চারটি পাহাড়ের উপর রেখে দিলেন। একথাটি যখন শয়তান শুনল তখন সে খান্নাসের নাম ধরে ডাক দিল। ওহে খান্নাস বলার সাথে সাথে সে পুনরায় জীবিত হয়ে টুকরোগুলো একত্রিত হয়ে সামনে এসে গেল। যখন শয়তান চলে গেল আর আদম আলাইহিস্‌সালাম এসে হাওয়া আলাইহাস্‌সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি ঘটনার বিবরণ বর্ণনা করলেন। অতঃপর আদম আলাইহিস্‌সালাম খান্নাসকে পুনরায় প্রাণে বধ করে দিলেন এবং তাকে অগ্নিতে জ্বালিয়ে ছাইভস্ম নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। যখন আদম আলাইহিস্‌সালাম চলে গেলেন তখন পুনরায় শয়তান এসে হযরত হাওয়া আলাইহাস্‌সালামকে জিজ্ঞাসা করল যে, খান্নাস কোথায় গেল? তিনি উত্তর দিলেন, তাকে অগ্নিদাহ করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে। শয়তান পুনরায় খান্নাস বলে ডাক দিলে সে তড়িৎ গতিতে হাজির হয়ে গেল। আর সে আগের মতো হাওয়া আলাইহাস্‌সালাম এর নিকট গচ্ছিত রেখে চলে গেল, তখন হযরত আদম আলাইহিস্‌সালাম পুনরায় খান্নাসকে মেরে ফেললেন। এবার তাকে ভুনা করে হযরত আদম আলাইহিস্‌সালাম খেয়ে ফেললেন। শয়তান এসে ওগো মোর খান্নাস! বলে আহ্বান করল। তখন খান্নাস আদম আলাইহিস্‌সালাম এর দিল বা অন্তরের মধ্য হতে আওয়াজ দিল। শয়তান বলল, এবার তুমি এখানেই থাক অর্থাৎ অন্তরের মধ্যেই অবস্থান কর, আমার উদ্দেশ্যও ছিল তাই।

পবিত্র কুরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয: আয়াতাত্‌শ “ওআ লা তাশতারু বিআয়াতী চামানান ক্বালীলা” অর্থাৎ— এবং তোমরা আমার আয়াত সমূহ কোন নগণ্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করোনা আয়াত নং-৪১। আল্লাহ তা’আলার আয়াত সমূহের বিনিময়ে মূল্যগ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো মানুষের মর্জি ও স্বার্থের তাগিদে আয়াত সমূহের মর্ম বিকৃত বা ভুল ভাবে প্রকাশ করে কিংবা তা গোপন রেখে টাকা পয়সা, অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা। একাজটি উম্মতের জন্য সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম। তবে কুরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় বা

পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সম্পর্কে ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল রাহেমাহুমুল্লাহ জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। বিশ্বখ্যাত হানাফী ফিকহের কিতাব দুররে মুখতার, শামী এর ভাষ্যানুযায়ী পরবর্তী হানাফী ইমামগণ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ পূর্বক দেখলেন যে, পূর্বে কুরআনের শিক্ষকমন্ডলীর জীবন যাপনের ব্যয়ভার ইসলামী বায়তুলমাল (ইসলামী রাষ্ট্রীয় কোষাগার) বহন করত, কিন্তু বর্তমানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ শিক্ষক মন্ডলী কিছুই লাভ করেন না। ফলে তারা অন্য জীবিকা অন্বেষণের দরুন ছেলে-মেয়েদের কুরআন শিক্ষার দ্বার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে প্রয়োজনানুপাতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমামতি, আযান, হাদিস ও ফিকহ শিক্ষাদান প্রভৃতি যে সব কাজের উপর দ্বীন ও শরীয়তের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে সেগুলোকেও কুরআন শিক্ষা দানের সাথে সংযুক্ত করে প্রয়োজন মত এগুলোর বিনিময়েও বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

পার্শ্ব সম্পদে অহংকার এবং দরিদ্র লোকের প্রতি উপহাসের পরিণতি: দুনিয়ার ধন সম্পদ ও মান সম্মানের উপর নির্ভর করে অহংকার করা এবং দরিদ্র লোকের প্রতি উপহাস করার পরিণতি কিয়ামতের দিন চোখের সামনে ভেসে উঠবে। হযরত আলি শেরে খোদা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু হতে বর্ণিত রয়েছে যে ব্যক্তি কোন মুমিন স্ত্রী বা পুরুষকে তার দারিদ্রের জন্যে উপহাস করে, আল্লাহ তা’আলা তাকে কিয়ামতের দিন সমগ্র উম্মতের সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুমিন স্ত্রী বা পুরুষের উপর এমন অপবাদ আরোপ করবে, যে দোষে সে দোষী নয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে একটি উঁচু অগ্নিকুন্ডের উপর দাঁড় করাবেন, যতক্ষণ না সে তার মিথ্যার স্বীকারোক্তি করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সেখানে রাখা হবে। (কুরতুবী)

জাদু ও মুজিয়ার পার্থক্য: আশিয়া-ই-কিরামের মুজিয়া এবং আউলিয়া-ই-কিরামের কারামাত দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, যাদুর মাধ্যমেও বাহ্যত তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে মুর্থ লোকেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে জাদুকরদেরকেও সম্মানিত ও মাননীয় মনে করতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে মুজিয়া প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর কাজ আর জাদু অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। এ পার্থক্যটিই মুজিয়া ও জাদুর স্বরূপ বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। স্মর্তব্য যে, মুজিয়া ও কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, যাদের খোদাভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র ও কার্যকলাপ সকলের দৃষ্টির সামনে থাকে। পক্ষান্তরে জাদু তারাই প্রদর্শন করে, যারা নোংরা, অপবিত্র এবং আল্লাহর যিকির (স্মরণ) থেকে দূরে থাকে। এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মুজিয়া ও জাদুর পার্থক্য বুঝতে পারে।

দুনিয়া মু'মিনের জন্যে বন্দীশালা, আর কাফিরদের জন্যে জাহান্নাম: মহানবী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ উক্তি তাৎপর্য হলো মুসলমান যতক্ষণ ঈমান ও ইসলামের নাম উচ্চারণ করে, আল্লাহর মাহাত্ম্য ও ভালবাসার দাবী করে ততক্ষণ সে বন্ধুরই তালিকাভুক্ত থাকে। ফলে তার মন্দ আমলের সাজা সাধারণতঃ দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয়। যাতে পরকালের বোঝা কিছুটা হলেও হালকা হয়ে যায়। কাফিরদের অবস্থা এর বিপরীত সে বিদ্রোহী ও শত্রুর আইনের অধীন। দুনিয়াতে হালকা শাস্তি দিয়ে তার শাস্তির মাত্রাহ্রাস করা হয় না। তাকে পুরোপুরি শাস্তির মধ্যেই নিষ্ক্ষেপ করা হবে।

ঈমানের মূলনীতি এক ও অভিন্ন: প্রত্যেক নবীর শরীয়তেই ঈমানের মূলনীতি এক ও অভিন্ন তবে সৎকর্মের আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। তওরাতের যুগে যে সব কাজকর্ম মুসা আলাইহিসসাল্লাম ও তওরাতের শিক্ষার অনুরূপ ছিল, তাই ছিল সৎকর্ম। তদ্রূপ ইঞ্জিলের যুগে নিশ্চিতরূপে তাই ছিল সৎকর্ম, যা হযরত ঈসা আলাইহিসসাল্লাম ও ইঞ্জিলের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এখন কুরআনের যুগে ঐসব কার্যকলাপই সৎকর্ম রূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, যা সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী ও তৎকর্তৃক আনীত গ্রন্থ আল কুরআনুল করিমের হিদায়তের অনুরূপ। তওহীদে আদিয়ান বা ধর্মসাম্য বলতে ঈমানের এ অভিন্ন মূল নীতিকেই বুঝানো হয়েছে। দ্বীন ইসলামের পূর্ববর্তী সর্ব ধর্মের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদের উপর যারা যারা প্রতিষ্ঠিত ছিল তারা সবাই মুক্তি প্রাপ্ত। এটাই তওহীদে আদিয়ানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

তিন মসজিদ ব্যতীত বিশ্বের সকল মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত: শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত। বায়তুল মুকাদ্দাস, মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর অবমাননা, যেমনি বড় ধরনের জুলুম, তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা সমভাবে প্রযোজ্য। তবে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মাহাত্ম্য ও সম্মান স্বতন্ত্র ভাবে স্বীকৃত। মসজিদে হারামে এক রাকাত নামাযের সওয়াব এক লক্ষ রাকাত নামাযের সমান এবং মসজিদে নববী ও বায়তুল মুকাদ্দাসে পঞ্চাশ রাকাত করে নামাযের সমান। এই তিন মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে দূর দূরান্ত থেকে সফর করে সেখানে পৌঁছা বিরাট সওয়াব ও বরকতের বিষয়। কিন্তু অন্য কোন মসজিদে নামায পড়া উত্তম মনে করে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আসতে বারণ করা হয়েছে। (তফসীর মা আরেফুল কুরআন পৃঃ ৫৬) এ প্রসঙ্গে এ হাদিসটি প্রণিধান যোগ্য যে “লা তাসুদুর রিহালা ইল্লা ইলা সালাসাতে মসজিদা” ভাবার্থ হলোঃ বর্ণিত মাহাত্ম্য পূর্ণ তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের দিকে গাঢ়ি-বোচকা, কাঁথা-বালিশ, হান্দি-পাতিল, লাকড়ির বোঝা কাঁধে মাথায় নিয়ে অশেষ কষ্ট স্বীকার করে তবলীগ করার নামে দূর-দূরান্ত ভ্রমণ করতে যাওয়া ইসলাম ধর্ম সম্মত নয়। বরং তা কঠোরভাবে বারণ করা হয়েছে। অনেকে উক্ত হাদিস শরীফকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নবী-ওলীর মাজার-রওজা শরীফ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে

সফর করাকে অবৈধ প্রমাণ করার ঘৃণ্য প্রয়াস চালায়। এটা কোন ভাবেই উচিত নয়। তবলীগ জামাত নামে এক ভ্রান্ত দলের উদ্ভব হয়ে তারা মসজিদে মসজিদে Picnic বা চড়ুই ভাতি খাওয়ার রিওয়াজ চালু করবে; এ অবস্থা আলেম বিল গাইব বা অদৃশ্য ঘটনা দ্রষ্টা নবী ভবিষ্যৎ বাণী করে হাজারো বছর পূর্বে নিষেধাজ্ঞা জারী করে গেছেন; যাতে তারা ঐ ধরনের গর্হিত কর্মে লিপ্ত হতে না পারে। আমরা ইতিপূর্বে তবলীগ জামাতের বাতিল আকীদার বর্ণনা প্রদান করেছি।

মুকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা বানানো: সুরা বাকারাহর ১২৫ নং আয়াতাতংশে আল্লাহ পাক বলেন: “ওয়াত্তাখিজু মিম মুকামে ইবরাহীমা মুসাল্লা” অর্থাৎ- আর তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে নামাযের স্থান বানাও। এখানে মুকামে ইবরাহীমের অর্থ ঐ পাথর, যাতে মুজিয়া হিসেবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিসসাল্লাম এর পদচিহ্ন অংকিত হয়ে গিয়েছিল। পবিত্র কাবা নির্মাণের সময় এ পাথরটি তিনি Lift বা সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। ঐ পাথরটিতে তিনি পা মুবারক রেখে ছিলেন আর ঐ পাথর যতটুকু উঁচুতে প্রয়োজন তথায় সিঁড়ির মতো তাঁকে হাওয়ায় তুলে ধরতেন। নবীর কদম মুবারক যাতে শক্ত পাথরে ব্যাথা না পায় সে জন্য পাথর Sponge বা ফোমের তুল্য নম্র হয়ে গিয়েছিল আর তাঁর পদচিহ্ন সেখানে গভীরভাবে অংকিত হয়ে গিয়েছিল। আমি (লেখক) ১৯৮৩ ঈসায়ী সনে যখন হজ্জে আকবর পালনে পবিত্র মক্কা নগরীতে যাই তখন হারাম শরীফে অবস্থিত ঐ মুকামে ইবরাহীমের জ্বালী বেষ্টনির মধ্যে দৃষ্টি দিয়ে দেখি ঐ যুগল পদচিহ্ন আমাদের এক হাতের সমান দীর্ঘ হবে এবং ব্যাস হবে পৌনে এক হাতের মতো। একেকটা আংগুল মুবারক ২/১ ইঞ্চি পরিমাণ মোটা হবে। এই ছাপ প্রায় একইঞ্চি পরিমাণ গভীর হবে। আকীদতের নজরে দৃষ্টি দিয়ে দেখলে ঐ পদচিহ্ন দুটি একেবারে প্রাণবন্ত ছলছল করে অতি সন্তর্পণে নড়াচড়া করছে বলে মনে হয়। নবীগণ যেমন জীবিত তাঁদের পদচিহ্নও জীবন্ত; সুবহানাল্লাহ! প্রসংগত উল্লেখ্য যে, পবিত্র কাবা শরীফের দিকে কিবলা করে আল্লাহকে সিজদা দেয়া হচ্ছে বটে প্রত্যক্ষভাবে হযরত নবী ইবরাহীম খলিলুল্লাহ আলাইহিসসাল্লামের পদচিহ্নকে ও সম্মানী সাজদা প্রদানে রত রয়েছেন সকল তওয়াফ কারী হজ্জ-ওমরা পালনকারীসহ লক্ষ লক্ষ তওয়াফকারীগণ। এতে সাজদাহ এ তাহুইয়া বা তাজীমির বিরোধীরা তাদের মনের অগোচরে সে কাজটিই করে ফেলে যেটার তারা বিরোধীতা করে থাকে। আল্লাহ তা'য়ালাই ভাল জানেন। হাদীসে পাকে আছে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুকামে ইবরাহীমের পেছনে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামায পড়লেন যে, কাবা ছিল তাঁর সম্মুখে এবং কাবা ও তাঁর মাঝখানে ছিল মুকামে ইবরাহীম- (সহীহ মুসলিম শরীফ)

মাসআলা: তওয়াফ পরবর্তী এই দু রাকাত নামায ওয়াজিব বা আবশ্যিক (জাসসাস-মুল্লা আলী কারী)। তবে এ দু রাকাত নামায বিশেষভাবে মুকামে ইবরাহীম এর পিছনে পড়া সূনাত।

অলিকুলের চির মহাবিস্ময় হযরত বড় পীর গাউসুল আযম সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)

• ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী •

হযরত বড় পীর (রঃ)র আবির্ভাবকালে মুসলিম

বিশ্বের তদাভীন্তন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট:

হযরত বড় পীর গাউসুল আযম, কুতুবুল আলম, পীরানে পীর দস্তগীর, মাহবুবে সোবহানী, আফজালুল আউলিয়া, মুহিউদ্দীন, শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী আল-হাসানী ওয়াল হোসাইনী (রঃ)র আবির্ভাবকালে তৎকালীন ইসলামী দুনিয়ার অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। তৎকালে ইসলামী বিশ্ব তিনটি খেলাফতে বিভক্ত ছিল, যথাঃ উমাইয়া খেলাফত, আব্বাসীয়া খেলাফত ও ফাতেমী খেলাফত। ১৩৯ হিজরী সনে আবদুর রহমানের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী স্পেন বিজয় করে এবং তথায় উমাইয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করে। ৫২৮ হিজরী সন পর্যন্ত তথায় উমাইয়া শাসন বজায় ছিল। স্পেনে উমাইয়া খেলাফতের সর্বশেষ শাসক ছিলেন হেশাম ইবনে হাকাম। হাকামের মৃত্যুকালে পুত্র হেশাম ছিলেন একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক। মৃত্যুকালে হাকাম তাঁর পুত্র হেশামকে খলিফা পদে নিযুক্ত করে স্বীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মসানী এবং প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ বিন আবি আমিরকে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক মনোনীত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু হাকামের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রধানমন্ত্রী আমির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মসানীকে তাঁর পক্ষে নিয়ে আসেন এবং বহুসংখ্যক প্রাদেশিক গভর্নর ও শাসনকর্তাকে হত্যা করে খলিফা হেশামকে নজরবন্দী করেন এবং নিজে মনসুর-উদ-দৌলাহ্ নাম ধারণ করে ক্ষমতার মসনদে বসেন। জুম্‌আর খোত্বায় খলিফা হেশামের নামের সাথে নিজের নামও যোগ করার জন্য তিনি ফরমান জারি করেন। মনসুর-উদ-দৌলাহ্ কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী থেকে আরব বংশোদ্ভূত জাতশক্রতে পরিণত হন। তাঁর সময় বারো বার বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, কিন্তু প্রতিবারই তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন। শুধু আরব সৈন্যদের সাথে নয়, খ্রিস্টানদের সাথেও মনসুরের শত্রুতা সৃষ্টি হয়। ৩৮৮ হিজরীতে মনসুরের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র আবদুল মারিক 'মোজাফফর' নাম ধারণ করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ৫২৮ হিজরী সনের পর থেকে স্পেনে খ্রিস্টানদের শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মোজাফফরের উত্তরসুরীগণ ৫৩২ হিজরী পর্যন্ত স্পেনকে খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু ৫৩২ হিজরী সনে মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। একদিকে মোহাম্মদ ইবনে তুমারত নামক এক ভণ্ড মাহদী মরক্কোতে 'আল-মাওয়াহেদীন' নামে এক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। তুমারতের নেতৃত্বে তথাকথিত একত্বাদীরা মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। অন্যদিকে

মুসলিম শাসকগণ খ্রিস্টানদের কবল থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এ দ্বিমুখী সংকটের মুখে স্পেনে মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়েছিল।

এমনি সন্ধিক্ষণে ইমাম জাফর সাদিকের মৃত্যুর পর শিয়াগণ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের মধ্যে বড় দলটি ইমাম মুসা কাজেমকে তাদের পরবর্তী ইমাম বলে ঘোষণা দেয় এবং ছোট দলটি ইসমাইল ইবনে মোহাম্মদকে তাদের ইমাম বলে দাবী করে। তারা ইসমাইল (রঃ) এক সময়ে লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন বলে প্রচার করে। আসলে তারা তাঁকে হত্যা করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রতারণার জাল বিস্তার করে রেখেছিল। এই ইসমাইলীয়রা মূলতঃ ইরান বংশোদ্ভূত একটা সম্প্রদায়ের লোক। তারা গণ্যমান্য ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধা করত এবং শিয়া ও সুন্নীদের ছদ্মাবরণে ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রচার ও ফাতেমী খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। ২১৬ হিজরীতে তারা মিশরে ফাতেমী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষমও হয়েছিল। পরবর্তীকালে কারামতা ও বাতেনীয়া নামধারী এই ভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায় মিশরে ৫০৫ হিজরী সন পর্যন্ত ফাতেমী খেলাফত অব্যাহত রেখেছিল।

সমসাময়িককালে বাগদাদে চলছিল আব্বাসীয় খেলাফত। ৪৪৬ হিজরী সনে বাগদাদের খলিফা ছিলেন আল-কায়ম বে-আমরিলাহ্। আরসালান নামক এক তুর্কী সর্দার খলিফার প্রধানমন্ত্রী মালিক রহিম বুইয়াকে অপসারণ করে নিজে প্রধানমন্ত্রী হয়ে যান এবং খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সমগ্র ইরাকে প্রতিটি মসজিদে ফাতেমীয় খলিফা আল-মুসতানসিরের নামে খোত্বা পাঠের ব্যবস্থা করেন। এ দুর্দিনে আলপ নামক অন্য এক তুর্কী নেতা সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন এবং তিনি আরসালানকে পরাভূত করে খলিফা আল-কায়ম বে-আমরিলাহ্কে পুনরায় ক্ষমতায় বসান। এদিকে মিশরে ৪৮৮ হিজরীতে মুসতানসিরের পরে আল মুসতালী বিলাহ্ খলিফা হন।

বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাগণ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। মোমের পুতুলের ন্যায় তারা ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তারা নামে মাত্র খলিফা থাকলেন বটে, তবে প্রকৃত ক্ষমতা ছিল সেলজুকী সোলতানদের হাতে। ৪৬৭ হিজরীর শাবান মাসে খলিফা কায়ম বেআমরিলাহ্ মৃত্যু মুখে পতিত হলে সেলজুকী সোলতান মালিক শাহ্ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। খাজা হাসান নেজামুল মুল্ক তুসী সোলতানের প্রধানমন্ত্রী হলেন। শাসন ক্ষমতার এরূপ শোচনীয় বিপর্যয়ের ফলে ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা ও ইসলামী মূল্যবোধে চরম অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়।

হযরত বড় পীর (রাঃ)-এর আগমনকালে

মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় সঙ্কট:

বনী উমাইয়ার কুখ্যাত নরাধম এজিদের বংশদের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে হিজরীর পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে আব্বাসীয় খলিফাগণ অতি দোর্দণ্ড প্রতাপে বাগদাদের সিংহাসনে রাজত্ব করছিলেন বটে, কিন্তু তাদের অনেকে খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক প্রদর্শিত ও প্রতিষ্ঠিত পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক মহান আদর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হননি। তদানীন্তন বিশ্বের অন্যান্য রাজা-মহারাজার ন্যায় তাঁরাও ক্ষমতা বিস্তার এবং আরাম আয়েসের মধ্যেই নিজেদেরকে নিমগ্ন রেখেছিলেন। চরিত্র মাধুর্য, ন্যায়-সাম্য, ভ্রাতৃত্ব-সৌহার্দ, উদারতা, মহানুভবতা, কল্যাণকামীতা, সহর্মিতা প্রভৃতি গুণাবলী তাঁদের মধ্যে লুপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছিল। এরূপ অবাস্তিত আচরণের অধিকারী খলিফাদের প্রভাবে আপামর জনসাধারণের চরিত্রও পরিবর্তিত হয়ে যায়। ইসলামের প্রকৃত বিধি-বিধান বিস্মৃত হয়ে ক্রমশঃ সবাই ধন-ঐশ্বর্য ও পার্থিব ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। যে সুদৃঢ় ঐক্য এক সময় সমগ্র মুসলিম জাতিকে ভ্রাতৃত্ব ও প্রেম-প্রীতির মধুর বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল, তা ক্রমশঃ হিংসা-বিদ্বেষ, অত্যাচার-উৎপীড়নের দ্বারা শিথিল হয়ে পড়ে। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব নৈরাজ্যের এক বিভীষিকাময় রূপ পরিগ্রহ করে। আলুতি সম্প্রদায়ের একজন ধূর্ত লোক বলে কথিত মোহাম্মদ বিন হানিফ নামক এক ভণ্ড নবীর আবির্ভাব, মোহাম্মদ ইবনে তুমারত নামক এক ভণ্ড মাহদীর আবির্ভাব, বাতেনিয়া ও কারামত নামধারী দু'টি ভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায়ের প্রচারণা প্রভৃতি মুসলমানদেরকে ধর্মের নামে অধর্মের পথে ঠেলে দিয়েছিল। অবশ্য দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সুলতান মাহমুদ কারামত আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর হাসান ইবনে সাবাহ নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে কারামত আন্দোলন জোরদার হওয়ায় মুসলমানগণ আরও বেশী পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হযরত বড় পীর (রাঃ)র শান, মান ও মর্যাদার কিঞ্চিৎ বর্ণনা: ইসলামের এ চরম দুর্দিনে ও মহাসংকটময় যুগ-সঙ্কিক্ষণে মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করে অতীতের পূর্ণ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বিশ্বে এমন এক অসাধারণ গুণ-গরিমা ও জ্ঞানের অধিকারী এবং প্রভূত আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন একজন মহাপুরুষের আগমন ঘটল, যিনি ইসলামের পুনরুজ্জীবনে যুগান্তকারী অবদান রাখলেন। সকল প্রকার কুসংস্কার ও ভ্রান্ত মতবাদের মূলে কুঠারাঘাত করলেন। কথিত আছে যে, একদা হযরত রসূলে করিম (দঃ) তাঁর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)র সাথে আলাপ প্রসঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর বংশে নয়জন এবং হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর বংশে একজন বিশ্ববরণ্য অলিকুলের সর্দার জন্মগ্রহণ করে উভয়ের বংশকে গৌরবান্বিত করবেন। পিতার দিক

থেকে তিনি হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)র বংশধর এবং মাতার দিক থেকে তিনি হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)র বংশধর। তাই হযরত বড়পীর (রাঃ) কে আল-হাসানী ওয়াল- হোসাইনী লকবেও ভূষিত করা হয়, যিনি প্রিয়নবী (দঃ)র উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর জ্বলন্ত উদাহরণ। অসীম করুণাময় মহান দাতা আল্লাহ নবীকুল শিরোমনি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) কে সমগ্র বিশ্ব জগতের রহমত ও শ্রেষ্ঠ নবীরূপে এ ধরায় পাঠিয়েছেন যেন তাঁর অনুসারী উম্মতগণ শেষ বিচারের দিনে নাজাত পেতে পারে। এ অনুসারী উম্মতের মধ্যে তাপসকূলের সূর্য, তত্ত্বজ্ঞানের মহান জ্যোতিষ্ক ও দয়ার সাগর গাউসুল আযম হযরত শেখ সৈয়দ মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত যার স্থান উম্মতগণের মধ্যে সবার উপরে। কারণ তিনি স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, অনুপম এবং অতুলনীয়। তাঁর অসাধারণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে যা বলা হয়ে থাকে তা অতিশয়োক্তি কিংবা অতিরঞ্জিত নয়। হযরত গাউসুল আযম বড় পীর (রাঃ) আল্লাহর ইশ্ক ও মহব্বতে ফানাফিল্লাহ অবস্থায় যা ঘোষণা করেছিলেন এবং যা কসিদায়ে গাউসিয়ায় লিপিবদ্ধ আছে, তা সকলের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। হযরত বড় পীর (রাঃ) বলেন, “একদিন প্রিয় নবী (দঃ) আমার হাত ধরে সিংহাসনের ললাট চুম্বন করে স্বীয় পিরহানটি স্বহস্তে আমাকে পরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমাকে গাউসিয়ত ও বেলায়তের সর্বোচ্চ খেলাফত দান করে সকলের উপর আদেশ দাতা, রক্ষাকর্তা ও ত্রাণকর্তা করে দিলাম।”

হযরত বড় পীর (রাঃ)র মরতবা একমাত্র আল্লাহুতায়লা ও তাঁর পেয়ারা হাবিব হযরত রসূলে করিম (দঃ)ই অবগত আছেন। ‘সারেনছুক’ নামক গ্রন্থে হযরত দাউদ (রাঃ) বলেছেন, “যিনি অজু করে পবিত্র হয়ে হযরত বড় পীর (রাঃ)র নাম নিতেন, তিনি সারাদিন অতি সুখে কাটাতেন। আর যিনি বিনা অজুতে অপবিত্র হয়ে তাঁর নাম নিতেন, তাঁর জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেত।” ‘মানাকেবে গাউসিয়া’ কিতাবে লিখিত আছে যে, হযরত বড় পীর (রাঃ)র বংশধরগণ সকাল-সন্ধ্যায় হযরত বড় পীর (রাঃ)-এর মাহবুবে সোবহানী নামাঙ্কিত ‘দোয়ায়ে ছায়ফুল্লাহ’ পড়তেন এবং বিভিন্ন ফায়দা হাসিল করতেন। তাঁদের দেখাদেখি অন্যান্য লোকজনও ‘দোয়ায়ে ছায়ফুল্লাহ’ পড়া শুরু করে এবং বিভিন্ন উপকার পেতে থাকে। এভাবে বহু বৎসর অতিবাহিত হবার পর লোকজন আলস্যবশতঃ বিনা অজুতে এ দোয়াটি পড়তে শুরু করলে তাদের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল। এরূপ অবস্থায় হযরত রসূলে করিম (দঃ) স্বপ্নযোগে হযরত বড় পীর (রাঃ)কে বললেন, “হে আবদুল কাদের! তুমি এ কি জালালী হালত দেখাচ্ছ? কত শত লোক তোমার নাম নিতে গিয়ে দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন কিংবা জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার দরুণ প্রাণ হারাচ্ছে, তা’কি তুমি দেখতে পাচ্ছনা? মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যিনি পরম দয়ালু ও করুণাময় এবং আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা তাঁর নামতো সহস্রবার বিনা

অজুতে উচ্চারণ করলে কারো এরূপ দশা হয়না? তুমি অবিলম্বে এ হালত ত্যাগ কর এবং ভক্তদের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা দেখাও।” হযরত বড় পীর (রঃ) দয়াল নবীজী (দঃ)’র কথায় অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং সাথে সাথেই এ হালত ত্যাগ করে বললেন, “হে দোজাহানের কাভারী, দয়ার সাগর, রহমতুল্লীল আলামীন! আমি আপনার নির্দেশে আমার জালালী হালত প্রত্যাহার করে নিলাম। আর কখনও কারো মস্তক কাটা যাবে না কিংবা জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত হবে না। তবে বিনা অজুতে অপবিত্র অবস্থায় যারা আমার নাম নেবে, পৃথিবীতে তাদের কখনও উন্নতি হবে না। তাদেরকে নানা কষ্টে দিনাতিপাত করতে হবে।” বস্তুতঃ তিনি তাঁর অপূর্ব সাধনাবলে কামালিয়তের সর্বোচ্চ মর্যাদায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর প্রতি বেয়াদবী, অসম্মানজনক ব্যবহার তাঁর ক্রোধ উৎপাদন করে এবং কঠিন অমঙ্গল ডেকে আনে। অতঃএব, কথায় ও ব্যবহারে যাতে তাঁর প্রতি কোন প্রকার অসম্মান প্রদর্শন করা না হয়, সেদিকে হুঁশিয়ার থাকা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

হযরত বড় পীর (রঃ) জন্মলগ্ন, পিতামাতা এবং মাতৃগর্ভে থাকাকালে অলৌকিক ঘটনা:

কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলে ইরানের অন্তর্গত জীলান বা গিলান নামক জেলার নী বা নাইফ নামক স্থানে হিজরী ৪৭১ সালে ১ রমজান সুবেহু সাদেকের সময় হযরত বড় পীর (রঃ) এ ধরাধামে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁর পিতার নাম হযরত আবু সালেহু মুসা জঙ্গী (রঃ) এবং মাতার নাম হচ্ছে সৈয়দা উম্মুল খায়ের ফাতিমা (রঃ)। জীলান বা গিলান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁর নামের সাথে ‘জিলানী’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ভূগোলবিদ জামাল উদ্দিন আবুল মুহাসিনের মতে, বাগদাদ ও অয়াসিত শহরদ্বয়ের মাঝামাঝি ‘জীল’ নামক গ্রামে হযরত বড় পীর (রঃ) জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁকে জিলানী বলা হয়। আবার ‘মুজামুল বুলদান’ গ্রন্থে ‘জিলান’ কে একটি কবিলা বা গোত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এরূপ মতামত তেমন সমর্থন পায়নি।

হযরত বড় পীর (রঃ) মাতৃগর্ভে থাকাকালীন এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই তিনি মাত্র একবার তাঁর মাতার স্তন থেকে দুগ্ধ পান করেন। পরক্ষণে যখন পার্শ্ববর্তী মসজিদ থেকে ফজরের নামাযের আযান শোনা গেল, তখন তিনি আর তাঁর মাতার স্তন থেকে দুগ্ধ পান করেন নি। ফজর নামাযের পর তার মাতা তাঁকে দুগ্ধ পান করাতে শত চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন। তখন তাঁর পুণ্যবতী মাতা বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শিশু রমজানের রোজা রেখেছেন। তাঁর জন্মের পূর্বদিন সন্ধ্যায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। তাই কেউ ঐদিন রমজানের চাঁদ দেখতে পায়নি। ফজরের নামাযের পর কিছু মুসল্লী হযরত বড় পীর (রঃ)’র পিতা হযরত সৈয়দ আবু সালেহু মুসা জঙ্গী (রঃ)’র বাড়িতে এসে জানতে চাইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে যেহেতু চাঁদ দেখা যায়নি, রোজা রাখা ঠিক হবে কিনা। তাঁর বাবা উত্তর দিলেন, “আমার নবজাত শিশু আজ থেকে রোজা রেখেছে। গতকাল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও রমজান মাস শুরু হয়েছে। সুতরাং, আপনারা নিঃসন্দেহে রোজা রাখুন।” পরের দিন জীলান শহরের বাইরের বিভিন্ন স্থান থেকে সংবাদ এল যে শাবানের ২৯ তারিখ সন্ধ্যায় সর্বত্র রমজানের চাঁদ দেখা দিয়েছে। তবে শুধুমাত্র আকাশ মেঘলা থাকার

কারণে জীলান নগরে চাঁদ দেখা যায়নি। কি আশ্চর্য ব্যাপার! শিশুটি সবেমাত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে। অথচ যার উপর শরীয়তের কোন বিধি-নিষেধ তো দূরের কথা, কথা বলতে এবং বুঝতেও যিনি অক্ষম; তিনিই ইহজীবনের প্রথম দিন থেকেই রোজা রাখা শুরু করলেন। সূর্যাস্তের পর মাতৃদুগ্ধ দ্বারাই তিনি ইফতার করেন। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন হযরত বড় পীর (রঃ) একবার বাঘরূপে আবির্ভূত হয়ে একজন ভিক্ষুকবেশী লম্পট থেকে স্বীয় মহিয়সী মাকে রক্ষা করেছিলেন; অন্য একবার তাঁর মহিয়সী মাকে সর্পের দংশন থেকে রক্ষা করেছিলেন। হযরত বড় পীর (রঃ) শিশুকাল থেকেই কোনদিন তাঁর মাতার কোলে/কাপড়ে পায়খানা-প্রস্রাব করেননি। যখন তাঁর পায়খানা প্রস্রাবের হাজত হোত, তখন তিনি এক প্রকার অস্বাভাবিক প্রকাশ করতেন। এতে তাঁর বুদ্ধিমতি মাতা বুঝতে পারতেন যে, শিশু বাহ্য-প্রস্রাব ত্যাগ করবেন। সুতরাং, তাঁর মাতা যথারীতি বাইরে শিশুকে নিয়ে যেতেন এবং এসবের ব্যবস্থা করতেন।

শিশু হযরত বড় পীর (রঃ) নিজের দেহ থেকে কোনদিন বস্ত্র ফেলেননি কিংবা তিনি কোনদিন উন্মুক্ত অবস্থায় থাকেন নি। শরীরের কোন অংশ থেকে কাপড় সরে গেলে তিনি জোরে কান্না করতেন। কাপড় ঠিক করে দিলে তিনি কান্না বন্ধ করতেন। উল্লেখ্য যে, হযরত বড় পীর (রঃ)’র সাহেব মাতার ১৮ পারা, মতান্তরে ১৫ পারা কুরআন শরিফ মুখস্থ ছিল। গর্ভধারণ অবস্থায় তাঁর মাতা সাহেবা প্রত্যহ ১৮ পারা কুরআন মুখস্থ পড়তেন। হযরত বড় পীর (রঃ) মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় তা শুনে শুনে মুখস্থ করে ফেলেছিলেন, যা হযরত বড় পীর (রঃ) মজুবে প্রথম দিন ছবক নিতে গিয়েই প্রমাণ করেছিলেন। সোবহানাল্লাহ্।

হযরত বড় পীর (রঃ)’র ‘মুহিউদ্দিন’ উপাধি লাভ: কথিত আছে যে, হযরত বড় পীর (রঃ) একদিন বাগদাদ শহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় পথে রোগব্যধিগ্রস্ত এক বৃদ্ধের দেখা পেলেন। বৃদ্ধটি মুমূর্ষু অবস্থায় রাস্তায় শায়িত ছিল। তার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। বৃদ্ধটি হযরত বড় পীর (রঃ) কে বললেন, “আমি মৃতপ্রায়, আপনি আমাকে টেনে তুলুন এবং সাহায্য করুন।” অতঃপর হযরত বড় পীর (রঃ) তাঁকে টেনে তুললেন। হযরত বড় পীর (রঃ)’র হাত মোবারকের ছোঁয়া পাওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধ সঞ্জীবনীসুধা লাভ করলেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে নব জীবন ও যৌবন লাভ করলেন। হযরত বড় পীর (রঃ) বৃদ্ধের পরিচয় জানতে চাইলে বৃদ্ধ বললেন, “আমি হলাম ধীন ইসলাম। ধর্মের অপব্যাখ্যা ও কুসংস্কারের ফলে আমি মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলাম। আপনিই আমাকে পুনঃজীবন দান করলেন। আজ থেকে আপনার উপাধি হল ‘মুহিউদ্দিন’ বা ধর্মের পুনঃজীবন দানকারী।” উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহ্‌তালা হযরত বড় পীর (রঃ) কে এ মহাসম্মানিত উপাধিটি দেয়ার জন্য একজন ফেরেশতাকে রূপকভাবে জরাগ্রস্ত ব্যক্তিরূপে হযরত বড় পীর (রঃ)’র সামনে পাঠিয়ে ছিলেন। এ ঘটনার পর একদিন জুমার নামাজের সময়ে মসজিদে প্রবেশ করার সময় হযরত বড় পীর (রঃ) কে একদল অপরিচিত মুসল্লী ‘মুহিউদ্দিন’ বলে সম্বোধন করতে থাকেন। তখন থেকেই হযরত বড় পীর (রঃ) ‘মুহিউদ্দিন’ নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এ ঘটনাটি ৫১১ হিজরী সনে ঘটে বলে কোন কোন জীবনীকার অভিমত প্রকাশ করেছেন।

গাউসুল আযম মাইজভাগরীর (কঃ) আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গ

• জহুরুল আলম •

বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্বালি হযরত গাউসুল আযম শাহসুফি মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বাভাস প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এ পরিচ্ছেদে পীরানে পীর গাউসুল আযম শাহসুফি আবদুল কাদের জিলানীর (কঃ) বেলায়তকে গাউসিয়তের আরম্ভকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত গাউসুল আযম দস্তগীর কেবলা আলম ছিলেন তাজেদারে আউলিয়া। আর আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা অনুযায়ী গাউসুল আযমের শেরতাজ হলেন হযরত মওলা আলী মুশকিল কোশা (রাঃ)। মহানবী (দঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে গাদীরে খুম্ম নামক স্থানে হযরত আলীকে (রাঃ) ‘মওলা’ অভিধায় আখ্যায়িত করে তাঁর [হজুর (দঃ)] আধ্যাত্মিক মসনদের বেলায়ত) উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে যান। মহানবী (দঃ) এর নির্দেশনা অনুযায়ী খিলাফতে রাশেদার পর [হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)], হযরত উমর ফারুক (রাঃ), হযরত ওসমান যুনুরাইন (রাঃ), মওলা আলী মুশকিল কোশা (রাঃ) এবং হযরত হাসান (রাঃ) (ছয় মাস পর্যন্ত ছিল মহান পুণ্যবানদের খিলাফত ত্রিশ বছর) বেলায়তের ধারা প্রকাশ্য হবার আবশ্যিকতা দেখা দেয়। মহান খলিফা হযরত আলীর (রাঃ) শাহাদতের পর বেলায়তের গুঢ় রহস্যময় জ্যোতি আহলে বায়াতের পুণ্যময় উত্তরাধিকারীত্বের শরাফত বজায় রেখে গাউসুল আযম পদসোপানে হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) সমীপে সমর্পিত হয়। মূলতঃ তাওহীদের মর্মবাণী প্রচারের লক্ষ্যে মানবজাতিকে সংশোধন এবং সুউচ্চ নৈতিকমানে উন্নীত করার নির্দেশনা প্রদানের জন্য গোপনীয়তার আচ্ছাদনে আবরিত বেলায়ত, ‘গাউসুল আযম’ পদ পদবী ধারণ করে প্রকাশ্য রূপ নেয়। তিনি ইসলাম ধর্মের নামে সৃষ্ট নানা রকম ফেরকা-ফিতনার অবসান ঘটিয়ে সকলকে ইসলামের মৌলিক নীতিতে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ নেন। এ লক্ষ্যে ধর্মীয় বিধি বিধানের পাশাপাশি তিনি মানব সমাজকে “আত্মিকভাবে প্রেরণাদীপ্ত” করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ কারণে তিনি ‘মহীউদ্দীন’ বা ধর্মের নবজীবন দানকারী অভিধায় সম্বোধিত হয়ে থাকেন। হযরত উমর ফারুকের (রাঃ) ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী গাউসুল আযম পীরানে পীর দস্তগীর (কঃ) হলেন ‘ইরাকে’ অবস্থানকারী মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ‘রাজদূত’- “যিনি ইসলামের দৃষ্টি শক্তি এবং শ্রবণ শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।” আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিশ্লেষকদের মতে হযরত গাউসুল আযম পীরানে পীর কেবলা আলম হলেন বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদীর সূচনালগ্নের প্রাণপুরুষ। অর্থাৎ তাঁর মাধ্যমে গাউসুল আযম আযমিয়াতের শুরু। উমাইয়া-আব্বাসীয় রাজতন্ত্রের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের কালো ছায়ায় ইসলাম ধর্মের মৌলিক এবং সুনির্মল আদর্শ ও বিধান বিকৃত

হয়ে পড়ায় সত্য পথে নবজাগরণের লক্ষ্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পথ নির্দেশকের অনুপম দায়িত্ব বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মুহাম্মদীর মাধ্যমে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী দস্তগীর কেবলা আলমের আবির্ভাব হয়। আব্বাসীয় শাসনামলে ক্ষমতার লালঘোড়া যখন আদম সন্তানদেরকে অধিকারহীন করে দেয়, এ ধরণের বন্দী মানব সত্তা বিষয়ে আহলে বায়াতের পবিত্র উত্তরাধিকারীগণ যখন প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন তখন নির্মম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন আহলে বায়াতের পবিত্র উত্তরাধিকারীরাও। বাহ্যত শরীয়তের বিধানের প্রতি অনুগামীতা প্রদর্শন করলেও শাসক এবং তাদের নৈতিক স্থলন ছিল কল্পনাভীত-অবর্ণনীয়। শঠতা, প্রবঞ্চনা, দাঙ্কিতা এবং মিথ্যার প্রাধান্য সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে ইসলামের প্রধান শিক্ষা সততা, সরলতা সহজতা তিরোহিত হয়। নীতি নৈতিকতার প্রতি প্রত্যয়হীনতা, সর্বত্র চরম চাতুর্যবাদীতা, ভোগবাদী বিলাসী জীবনবাদের অকর্মণ্যতা মুসলিম জনসমাজকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ভুলে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করে। এ সময় শিক্ষা, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র বাগদাদে হযরত পীরানে পীর কেবলা আলম অনন্য নূরের জলসায় বিশ্বব্যাপী মহানবী (দঃ) ঘোষিত নীতিমালা পুনর্ব্যক্ত করে নব উদ্যমে তাওহীদের মর্মবাণীর উত্তাল তরঙ্গমালার সৃষ্টি করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক খেলাফতে উদ্ভাসিত পবিত্র প্রতিনিধিবৃন্দ নতুন চমকে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। এঁরা কেউ সিয়াসতের আঙ্গিনায় প্রকাশ্যভাবে জড়িত না হলেও কোন অবস্থায় কোন শাসকের অন্যায় অপকর্ম জুলুম নির্যাতনকে সমর্থন দেননি, বরং সামর্থ অনুযায়ী প্রতিবাদ করেছেন। মূলতঃ তাঁরা তখন মুসলিম শাসকদের উপর বেলায়তী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা রেখে মুসলিম শাসকদের সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রভাব রেখেছেন। তবে তাঁদের আধ্যাত্মিক প্রেরণাদীপ্ততার কারণে অনেক দেশে জালেম দাঙ্কিত দুর্বৃত্তপরায়ণ শাসকের নির্মম পরিণতি এবং পতন ঘটেছে।

পীরানে পীর গাউসুল আযম দস্তগীর কেবলা আলমের ওফাতের পাঁচশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে নানামুখী পরিবর্তন সাধিত হয়। তাঁর সমসাময়িক সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ আতায়ের রাসূল (দঃ) হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতীর বেলায়তের নির্দেশনায় পৌত্তলিকতার প্রাণকেন্দ্র ভারত বর্ষে মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন ঘটে। খাজা গরীবে নেওয়াজের সময় থেকে মুসলিম শাসকরা খিলজী, তুগলক, ঘোরী, লোদী, মোঘল, পাঠান নামাঙ্কিত হয়ে সুদীর্ঘ ৮০০ বছর ভারতে শাসন কার্য নির্বাহ করে। এ সময় শাসকরা কাউকে ধর্মান্তরিত করেন নি। বরং অলি দরবেশদের সুউচ্চ

নৈতিকতা এবং সুমধুর আচার অভ্যাসে প্রভাবিত হয়ে অনেকে স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হন। উল্লেখ্য যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিম শাসকদের নানামুখি শাসনের কালে কখনো বেলায়তের অধিকারী মহান আউলিয়ারা সম্রাট, সুলতান, রাজা বাদশাহর দ্বারস্থ হননি, শাসকদের নিকট থেকে তারা কখনো সাহায্য কামনা করেন নি। বরং অনেক দরবেশ রাজা বাদশাহদের দেখা সাফাতের অনুমতিও দিতেন না। অনেক দরবেশ তাদের নিকট সুলতান, রাজা বাদশাহ কর্তৃক প্রেরিত হাদিয়া উপঢৌকন ফেরত পাঠিয়ে দিতেন।

মুসলমানদের সাম্রাজ্য এশিয়া আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিশাল ভূ-খণ্ডে আইউবী, ফাতেমী, উমাইয়া, ওসমানিয়া (অটোমান) নামে প্রতিষ্ঠা পাবার পর ক্রান্তিকালীন শাসকরা দুর্বল চরিত্র, অহমিকা, দাঙ্গিকতা, ভোগবাদীতা, অনৈতিকতার দুষ্ট চক্রে, আড়ষ্ট হয়ে পড়ায় ধীরে ধীরে মুসলিম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ভারতবর্ষে সুবে বাংলায় পলাশীর আমবাগানে নবাব সিরাজ-উদ্দৌল্লাহর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় বৃটিশ বেনিয়া গোষ্ঠী শাসকের মানদণ্ড হস্তগত করে নেয়। ক্রমান্বয়ে সমগ্র ভারত ইংরেজদের করায়ত্ত হয়ে যায়। প্রায় একই সময় ইউরোপ আফ্রিকায় মুসলিম শাসনাধীন এলাকাসমূহ ফরাসী, পর্তুগীজ, স্পেনিশ এবং বৃটিশদের করতলগত হয়ে পড়ায় মুসলমানদের সুদীর্ঘ সময়ের পৃথিবীব্যাপী রাজনৈতিক আভিজাত্যের সমাপ্তি ঘটে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে মুসলিম আধিপত্যের অবসানের পর ইউরোপীয় বণিকরা নিজেদের রেনেসার বাণী নিয়ে এশিয়া আফ্রিকার দিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ইসলামী জীবনবাদ, আল্লাহর একত্ববাদের সঙ্গে মিশনারীদের প্রচারিত চিন্তাধারার মধ্যে এক ধরণের দ্বন্দ্ব এবং বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর দেশে দেশে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটায় এবং দেশের মধ্যে এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনপদেও বৃটেন, ফ্রান্স, পর্তুগীজ স্পেনিশদের দোর্দণ্ড প্রতাপের শাসন প্রতিষ্ঠা পায়। ইউরোপীয়রা নিজেদের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ এবং রাজা চার্চের ক্ষমতা ও প্রভাবের দ্বন্দ্ব সামাল দিয়ে বহির্বিশ্বে নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও জীবনচাচারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দ্রুত এগুতে থাকে। অন্যান্য অঞ্চলের মতো ভারতেও এ সমস্যা তীব্রতর হয়। এ সময় ভারতবর্ষে পৌত্তলিক ধর্মাচারীদের মধ্যে নবজাগৃতির সূচনা ঘটে। মোঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা এবং খৃস্টান-পৌত্তলিকদের উত্থান লক্ষ্য করে সমকালীন সমস্যার কারণ ব্যাখ্যাকারী হওয়ায় “THINKER OF CRISIS” হিসেবে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভীর (রহঃ) আবির্ভাব ঘটে। তিনি মুসলমানদের পতনের কারণসমূহ নির্দিষ্ট করে শাসনকার্যে বাদশাহদের অযোগ্যতা, অবহেলা, দায়িত্বহীনতা, আরামপ্রিয়তা, বিলাসীতা, ভোগবাদীতা, অকর্মণ্যতাকে দায়ী করেন। মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং মহানবীর (দঃ) নির্দেশিত বিধি নিষেধ পরিহার করে আমীর ওমরাহদের ব্যাভিচার, মদ্যপান, জুয়াখেলা, সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর খাদ্য গ্রহণ,

কামরিপু চরিতার্থকরণ এবং খায়েশে নফসানীতে লিপ্ত থাকা সেনাবাহিনীর অর্থলিপ্সা, জনসাধারণের প্রতি অত্যাচার নিপীড়ন, শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের অসাধু উপার্জন এবং নানাবিধ অসামাজিক কর্মে জড়িত থাকা, একশ্রেণীর ধর্মীয় আলেম ওলামাদের দ্বীনী এলম সম্পর্কে সীমাবদ্ধ ধারণা, পারস্পরিক কলহ, সাধারণ মুসলমানদের অন্যায় লোভ পরশ্রীকাতরতার কারণে নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটায়। ভারতসহ পৃথিবীর দেশে দেশে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতে বৃটিশ হুকুমতের পত্তন ঘটে। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর (রহঃ) মতামতের আলোকে সামাজিক তত্ত্ববিশ্লেষণ করে ভারতে মুসলমানদের একটি অংশের মধ্যে পুনর্জাগরণের ধারা সৃষ্টি হয়। ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রাক্কালে বাংলা অঞ্চলে বৃটিশদের বিরুদ্ধে ময়মনসিং এ সর্বপ্রথম গণপ্রতিবাদী আন্দোলনের সূচনা করেন অলিয়ে কামেল ফকির মজনু শাহ। মূলতঃ হযরত শাহ কামাল এবং শাহ জামালের মাজার ঘিরে ভক্ত অনুসারীদের নিয়ে সৃষ্ট মজনু শাহ এর প্রতিবাদী আন্দোলন পর্যায়ক্রমে ফকির বিদ্রোহে (আল্লাহর পাগল) রূপ নেয়। ময়মনসিং এর পাহাড়ী এলাকায় জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে ফকির নেতা টিপু শাহ পাগলার অসীম সাহসিকতায় উক্ত অঞ্চলে বৃটিশ শাসন বিপর্যস্ত হয়। তবে বৃটিশরা কুটকৌশলের মাধ্যমে নির্মম পন্থায় শক্তি প্রয়োগ করে ফকির বিদ্রোহ দমন করে। ফকির বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ করার পর এ বাংলায় শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভীর দার্শনিক নির্দেশনার আলোকে গড়ে ওঠা মুজাহিদ আন্দোলন দমনের দিকে বৃটিশরা ধাবিত হয়। এ সময় সৈয়দ নিসার আলী তীতুমীরের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ এবং হাজী শরীয়াত উল্লাহ-পীর মোহসেন উদ্দিন দুদু মিঞার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন বাংলার বিশাল এলাকা প্রকম্পিত করে তোলে। ফকির বিদ্রোহের মতো এসব আন্দোলনও বৃটিশরা দেশীয় সহযোগীদের অকুপণ সহযোগিতায় দমন করে দেয়। সে সময় ভারতে বৃটিশ পরাশক্তির সঙ্গে নবজাগৃত পৌত্তলিক শক্তির নানামুখি সম্পর্কের সমঝোতা ও সমন্বয় ঘটায় উপর্যুক্ত সংগ্রামসমূহ দমনে বৃটিশদের তেমন বেগ পেতে হয়নি। ভারতবর্ষে সিপাহী বিপ্লব এবং মুজাহিদ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর মুজাহিদ নেতাদের অনেকে দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দিকে ধাবিত হন এবং প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা গুটিয়ে নেন। ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়, আদম সন্তানদের মধ্যে অনৈক্য, আচার ধর্মের ভিন্নতার কারণে সৃষ্ট বিভেদ, বিবাদ এবং নিয়মিত কলহ কোন্দল সংঘর্ষ মানবজাতির “আশরাফুল মাখলুকাত” অবস্থানকে বিনাশের মুখে নিপতিত করে। এক জাতির উপর অন্য জাতির কর্তৃত্ব, দমন পীড়ন ও নিঃশেষীকরণ, ধর্মের উপর অপ ধর্মের কর্তৃত্ব, নৈতিকতার উপর অনৈতিকতার দাঙ্গিক অবস্থানের কারণে বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানব সন্তানকে অসহায় অনিরাপদ অবস্থান থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মানবজাতির সম্মুখে পথ প্রদর্শনের জন্য একজন পরম আধ্যাত্মিক শক্তি

সম্পন্ন ত্রাণকর্তার আবির্ভাব জরুরী হয়ে পড়ে। এই ত্রাণকর্তা মানবজাতির শাস্বত বিশ্বাস একমাত্র সৃষ্টা মহান আল্লাহর প্রতি পরম আনুগত্যের শপথে সুউচ্চ নৈতিক জীবনমান প্রতিস্থাপনের বাণী নিয়ে “মানুষের ঐক্য” প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রদানকে বিশ্ববাসীর মুক্তির জন্যে জরুরী পয়গাম হিসেবে প্রাথমিক বিবেচনায় আনেন। সুগভীর তত্ত্বজ্ঞানী এবং ইলমে মারেফাতের রহস্যপূর্ণ কর্মকাণ্ডের অত্যন্ত পারদর্শী ব্যাখ্যা করে দিব্য দৃষ্টির অধিকারী হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর (রহঃ) নিশ্চিত বিশ্বাসগত বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর জন্মস্থান এবং বিকাশ স্থল চীনের পাদদেশে বলে উল্লেখ করেছেন। এই মহান অলি আল্লাহ্ আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক বিষয়ে হযরত শীস (আঃ) এর মসরবধারী হবেন বলে মহাত্মা আরাবী তাঁর ফুসুসুল হেকম এর ফচ্ছে শীসের শেষ ভাগে বর্ণনা করেছেন।

হযরত শীস (আঃ) প্রসঙ্গ:
হযরত নূহ (আঃ) এর “লায়ছা মিন আহালেকা” হল অবাধ্য পুত্র কেনান। আর প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আঃ) এর অবাধ্য সন্তান হলো কাবীল। দুর্বৃত্ত এবং স্বার্থান্ধ কাবীলের হাতে আল্লাহর অনুগত শান্তশিষ্ট আদম তনয় হাবীল শহীদ হলে হযরত আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়া (আঃ) স্বীয় আহলের শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েন। আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের বিষয়ে অতি বিনম্র স্বভাবের ছিলেন বিধায় হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত হাওয়া (আঃ) উভয়ই হাবীলকে খুবই স্নেহ করতেন। হাবীলের শাহাদাতের পরিপ্রেক্ষিতে যে খুন রাজা পথে আদম সম্প্রদায়ের রক্তাক্ত যাত্রার সূত্রপাত ঘটে তাতে হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত হাওয়া (আঃ) এর মানসিক স্বস্তির জন্য মহান আল্লাহ্ হাবীলের উত্তম বিনিময় হিসেবে হযরত শীসকে (আঃ) আদম (আঃ) এর ঔরশে প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে মহান আল্লাহ্ মহানবী (দঃ) এর সর্বোচ্চ সম্মান এবং ইজ্জত অক্ষত রাখার লক্ষ্যে নূরে মুহাম্মদী (দঃ) হযরত আদমের (আঃ) ললাটে পবিত্রতার সঙ্গে সংরক্ষণ করেন। হযরত আদমের (আঃ) ললাটে অবস্থানকারী পবিত্র নূরে মুহাম্মদী (দঃ) এর প্রথম জাগতিক বিকাশ হচ্ছেন হযরত শীস (আঃ)। হযরত আদম (আঃ) এর সন্তান সংখ্যা সর্বমোট ২৩৯ বা ৩৬১ বলে তফসীরকারকরা উল্লেখ করেন। এ বিজোড় সংখ্যার কারণ হচ্ছে হযরত শীসের (আঃ) সঙ্গে কোন বোন জন্ম নেননি। হযরত শীস (আঃ) একা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং হযরত আদমের (আঃ) ললাট থেকে ‘নূরে মুহাম্মদী’ অবিন্যস্ত অবস্থায় স্বাভাবিক প্রজনন প্রক্রিয়ায় হযরত শীস (আঃ) এর ললাটে স্থানান্তর ঘটে। হযরত আদমের (আঃ) অন্যকোন সন্তান এ পরম সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন না। হযরত শীস (আঃ) অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। ললাট জুড়ে ‘নূরে মুহাম্মদী’ চমক হযরত শীসের (আঃ) সৌন্দর্যকে নূরের আভায় অধিকতর কান্তিময় করে তোলে। তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী হাবীলের শাহাদাতের পাঁচ বছর পর হযরত আদমের (আঃ) ১৩০ বছর বয়সকালে হযরত শীস (আঃ) জন্ম নেন।

নূরে মুহাম্মদীর পবিত্র বাহক হওয়ায় এবং নবুয়তের নির্ধারিত উত্তরাধিকারীত্ব মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয় হওয়ায় আল্লাহর নির্দেশে হযরত আদম (আঃ) হযরত শীসকে (আঃ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত নবী হিসেবে প্রকাশ্যে নিযুক্তি দেন। মহান আল্লাহর সৃষ্টি এবং বিলয়ের বিধান অনুযায়ী হযরত (আঃ) ওফাতপূর্ব অসুস্থতায় আক্রান্ত হলে বেহেস্তী মেওয়া ফল ভক্ষণের জন্য আত্মহানিত হন। তিনি তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা পুত্রদের অবহিত করেন। হযরত শীস (আঃ) ব্যতীত অন্যান্য সন্তানরা মেওয়া সংগ্রহের লক্ষ্যে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন। তখন একা হযরত শীস (আঃ) হযরত আদমের (আঃ) সেবা শুশ্রূষায় নিয়োজিত থাকেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পরও মেওয়া সংগ্রহ করে কোন সন্তান ফিরে না আসায় অবশেষে হযরত আদম (আঃ) হযরত শীসকে (আঃ) বললেন, “শীস তুমি অমুক পাহাড়ের শীর্ষে উপবেশন করে আমার আত্মহের কারণে মেওয়া ফলের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ কর। মহান আল্লাহ্ অসীম রহমতে আমার জন্য নির্দিষ্ট ফল ফলারি প্রেরণ করবেন।” হযরত আদমের (আঃ) বক্তব্য শ্রবণ করে হযরত শীস (আঃ) বলেন, “আপনি আমার সম্মানিত মহান পিতা। আপনি প্রথম মানব। প্রথম মানব হিসেবে মহান আল্লাহর দরবারে আপনার মর্যাদা অপরিসীম। আপনি মুনাজাত করলে মহান আল্লাহ্ অসীম দয়ায় আপনার জন্য মেওয়া ফল প্রেরণ করবেন। নবী হিসেবে মহান আল্লাহ্ আপনার দোয়া কবুল করবেন।” প্রত্যুত্তরে হযরত আদম (আঃ) উল্লেখ করেন, বেহেস্তে অবস্থানকালে গন্দম ফল ভক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহর নিকট কোন বস্তু চাওয়ার ক্ষেত্রে আমি দারুন লজ্জিত থাকি। ফলে লজ্জাজনক সংকোচে থাকি বিধায় এ ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ পেশ করতে অপারগ হই। অথচ তুমি শীস (আঃ) এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে পবিত্র এবং কোন প্রকার ভুলের সঙ্গে তোমার সংশ্লিষ্টতা নেই। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্ তোমার দোয়া কবুল করবেন।

অবশেষে মহান পিতার নির্দেশ মত হযরত শীস (আঃ) পাহাড়ের শীর্ষে উপবেশন করে আল্লাহর দরবারে পিতৃ অভিপ্রায়ের বিষয়ে ফরিয়াদ পেশ করলে, মহান আল্লাহ্ পরম সন্তুষ্টিতে তা মঞ্জুর করেন। মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত জিব্রাইল (আঃ) হযরত শীস (আঃ) এর জোড়া স্বরূপ সংরক্ষিত বেহেস্তী ছর এর শিরে সোনালী রেকাবীকে বিভিন্ন জাতীয় ফল ফলারি দিয়ে সুসজ্জিত করে হযরত আদম (আঃ) সমীপে পেশ করেন। হযরত আদম (আঃ) বেহেস্তী ছরের আগমন লক্ষ্য করে উৎসুখ দৃষ্টিতে প্রশ্ন করলে হযরত জিব্রাইল (আঃ) বলেন, “এই ছর একাকী জন্মগ্রহণকারী আপনার পুত্র হযরত শীস (আঃ) এর জন্য মহান আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন এবং হযরত শীসের (আঃ) সঙ্গে এই ছরের বিয়ে পড়িয়ে দিতে আদেশ করেছেন।” বেহেস্ত থেকে প্রেরিত ফলফলারি হযরত আদম (আঃ) ভক্ষণের পর অবশিষ্ট পর্যাণ্ড ফল দিয়ে হযরত শীস (আঃ) এর ওয়ালিমা সম্পন্ন করা হয়।

সকল তফসীরকারক এবং ঐতিহাসিক একমত যে হযরত শীস (আঃ) এর বংশধারা হযরত নূহ (আঃ) হয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত নবুয়ত এবং পরহেজগারীর বিভিন্ন মাত্রিকতায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) থেকে হযরত ইসমাইল যবিউল্লাহ (আঃ) পর্যন্ত উপনীত হয়। আর হযরত ইসমাইল (আঃ) এর বংশে বিশ্ব জাহানের শ্রেষ্ঠতম পরিপূর্ণ মানবসত্তা 'ইনসানে কামিল' হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর আবির্ভাব ঘটে। উপর্যুক্ত বর্ণনায় দেখা যায়, (১) মেওয়া ভঙ্গনের জন্য হযরত আদম (আঃ) অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়া সত্ত্বেও নিজের কাম্যবস্তুর জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে লজ্জা সংরক্ষণ করেছেন। এর অর্থ মুনাজাতে লাজুকতা, সক্রমণ বিনম্রতা এবং রোনাজারি প্রদর্শন মুনাজাত কবুলিয়তের সর্বোত্তম পস্থা। (২) আল্লাহর দরবারে প্রার্থী নিজের কাম্য বিষয়ের জন্য ফরিয়াদ করার চেয়ে অন্যকোন মকবুল বান্দার মাধ্যমে করানোতে ফরিয়াদীর সম্ভ্রমবোধ সংরক্ষিত থাকে। (৩) নূরে মুহাম্মদী এমন এক পবিত্রতম সত্তা স্বয়ং মহান আল্লাহ নূরে মুহাম্মদী যার ললাটে সংরক্ষণ করেন, তাঁকে যমজভাবে পৃথিবীতে প্রেরণ করে এর পবিত্রতায় অংশীদারিত্ব রাখাকে 'একক ইলাহ' সত্ত্বার জন্য বস্তুনিষ্ঠ মনে করেন নি। (৪) মহানবী (দঃ) মহান আল্লাহর দরবারে দুটি পবিত্রতম নামে সম্বোধিত হন; (১) আহমদ (২) মুহাম্মদ। 'মুহাম্মদ' পৃথিবীতে প্রকাশ্যে সম্বোধিত। 'আহমদ' মহান আল্লাহর পরম সত্ত্বার সঙ্গে অতি সংগোপনে সংশ্লিষ্ট। 'আহমদ' নামের সঙ্গে অলৌকিক রহস্যময় জ্ঞান সংযুক্ত রয়েছে। হযরত শীস (আঃ) পৃথিবীতে এই রহস্যময় জ্ঞান ভাঙরের প্রথম প্রতিনিধি। এ কারণে তাঁর মুনাজাতের মাধ্যমে হযরত আদম (আঃ) এর জন্য বেহেস্তী মেওয়া ফল প্রেরিত হয়। (৫) ইসমে 'মুহাম্মদ' এবং ইসমে 'আহমদ' এর সুস্ব স্বাবস্থান হচ্ছে একটির মাধ্যমে পার্থিব বিধিবিধান জীবন প্রণালী এবং প্রাকৃতিক ধারার প্রকাশ ঘটেছে। অন্যটির মাধ্যমে মহান আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের গোপন রহস্যের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। একটিতে বিধি বিধানের প্রাধান্য রয়েছে। অন্যটিতে প্রেম মত্ততার প্রাধান্য রয়েছে। মহানবী (দঃ) জাতে নূর হিসেবে দুটিরই স্বত্বাধিকারী হিসেবে একমাত্র পরিপূর্ণ হিসেবে সৃষ্টির সর্বত্র প্রশংসিত হচ্ছেন। হযরত শীস (আঃ) হলেন 'আহমদ' মশরবের পয়গম্বর। এ পয়গম্বরের রহস্য হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত খিজির (আঃ) এর ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে স্পষ্ট করা আছে।

হযরত আদম (আঃ) এর পৃথিবী থেকে বিদায়ের সময় সন্নিহিত হলে পিতৃ সান্নিধ্য এবং সেবা যত্নে থাকা হযরত শীসকে (আঃ) অন্যান্য ভাইদের সমবেত করানোর জন্য আদেশ করেন। পিতৃ নির্দেশ মোতাবেক তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন আবাদী অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা সকল ভাইকে পিতার সম্মুখে উপস্থিত করলেন, অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নশ্বর জগত থেকে চিরস্থায়ী জগতে চলে যাবেন। তাঁর অবর্তমানে হযরত শীসকে (আঃ) স্থলাভিষিক্ত করে তাঁর প্রতি অন্যান্য সন্তানদের

আনুগত্যের অঙ্গীকার আদায় করে নেন। তরীকতের বিধি বিধানে হযরত আদম (আঃ) অনুসৃত স্থলাভিষিক্তের এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। হযরত শীস (আঃ) ছিলেন শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞানে গুণে আচার আচরণে সকল ভাইদের চেয়ে যোগ্যতম। ফলে হযরত শীস (আঃ) মানবজাতির প্রতি হেদায়তের নির্দেশিকা পৌছানোর দায়িত্ব অর্পিত হবার পর তিনি সর্বাবস্থায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আল্লাহর দীন প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "মহানবী (দঃ) ইরশাদ করেছেন, নবুয়ত লাভ করার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত শীসের (আঃ) উপর ৫০ খানা সহিফা (ধর্মীয় বিধান) নাযিল করেন।"

হযরত আদমের (আঃ) স্থলাভিষিক্ত হবার পরিপ্রেক্ষিতে ভাইদের সঙ্গে একত্রে থাকা সত্ত্বেও হযরত শীস (আঃ) চাষবাস অথবা কৃষিকাজ করতেন না। নবুয়তের মহান কার্য সম্পাদনে ব্যস্ততম সময় অতিবাহিত করার পরিপ্রেক্ষিতে সাংসারিক কোন কাজ করার সময় তাঁর হতো না। তিনি সর্বদা যেমন ধর্মকর্মে ব্যস্ত থাকতেন, তেমনি হযরত আদম (আঃ) এর আওলাদগণকে মহান আল্লাহর দীন শিক্ষা, সদাচারে প্রণোদনা প্রদান, সৎকর্ম শিক্ষাদান এবং পারস্পরিক কলহ ও ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করতেন। এ কারণে হযরত শীস (আঃ) ইহজাগতিক কর্মকাণ্ড শরীক না থাকলেও ভাইয়েরা তাঁর জন্য নির্ধারিত জমিতে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য অংশ তাঁর গৃহে পাঠিয়ে দিতেন। বছরের খরচাদি সামলাতে গিয়ে অন্যান্য ভাইদের পণ্য এবং ফসল শেষ হয়ে গেলে তাঁরা শীস (আঃ) থেকে ধার নিতেন। এভাবে ধার কর্তব্য নিয়ে সংসার পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে পড়ায় ভাইদের মধ্যে কেউ কেউ ইহজাগতিক কর্মে হযরত শীস (আঃ) এর অবস্থান নিয়ে সমালোচনা প্রবণ হয়ে ওঠে। ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন যে, এখন থেকে তারা হযরত শীস (আঃ) এর ন্যায্য অংশ হিসেবে যা স্বীকৃত তা প্রদান করবেন না। তাদের কারো কারো অভিযোগ যে তিনি ফাও বসে বসে উৎপাদিত পণ্যের অংশ নেন। তবে বিবেচক কয়েক ভাই সম্পূর্ণ একমত না হয়ে বলেন যে, তিনি অলসতার কারণে নন, বরং ধর্ম প্রচারের কারণে ব্যস্ত থাকায় উৎপাদন কর্মে অংশ নিতে পারেন না, তাই তাঁকে তাঁর প্রাপ্য অংশের একদশমাংশ দেয়া যায়। যে বৎসর ভাইদের এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় সে বৎসরই হযরত শীস (আঃ) এর নবুয়ত প্রকাশ পায়।

হযরত শীস (আঃ) এর প্রতি ভাইদের এ ধরনের আচরণের সঙ্গে গাউসুল আযম হযরত শাহসুফি মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী কেবলা আলমের ভাইদের উৎপাদিত ধানের অংশ বণ্টন নিয়ে একই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়। কলিকাতা থেকে স্থায়ীভাবে মাইজভাগুর শরিফ পিতৃগৃহে ফিরে আসার পর গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কেবলা আলম সর্বাবস্থায় গভীর ধ্যান, মোরাকাবা, মোশাহেদায় সময় অতিবাহিত করতেন। সাংসারিক এবং পারিবারিক কোন

কাজে নিজেকে জড়াতে না। তাঁর ভাব বিহ্বল অবস্থা এবং তন্ময় হাল লক্ষ্য করে পরিবারের সদস্যরাও তাঁকে কোন কাজে জড়াতে ইচ্ছুক হতেন না। পৈত্রিক অংশীদারীত্বের জমি জমায় যা উৎপাদন হতো ভাইয়েরা প্রতি বছর ন্যায্য অংশ তাঁর গৃহে পাঠিয়ে দিতেন। এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর ভাইদের মনে ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তা মাথা ছাড়া দিয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে বাড়ির অন্যান্য লোকদের উস্কানীতে গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কেবলা আলমের ভাইয়েরা হযরত কেবলা আলমের জাগতিক অবস্থাকে “ফাও ভাগ নেয়া” এবং “অলস বসে বসে অন্যের পরিশ্রমের ফল ভোগ করা” হিসেবে সমালোচনা করতে থাকে। এধরনের পারিবারিক মানসিকতার কালে একদিন ফসলের মৌসুমে সরু ধান ভাগ বণ্টন করে নেয়। অন্যদিকে গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কেবলা আলমের টুকরীতে কোন ধান প্রদান করেন নি। ভাইদের এ ধরনের বণ্টন নীতিতে গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কেবলা আলম কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন না করে শূন্য টুকরী হাতে স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় উক্ত দৃশ্য দেখে উপস্থিত কেউ কেউ উপহাসও করেন। ভাইরা গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কেবলা আলমের ন্যায্য অংশ আদায় না করলেও দেখা যায়, দুই তিন দিনের মধ্যে হাদিয়া হিসেবে হযরত কেবলা আলম, পঞ্চাশ আড়ি উত্তম প্রকৃতির সরু ধান প্রাপ্ত হন। হযরত শীস (আঃ) যেমন ভাইদের সঙ্গে সংঘটিত ঘটনার বছরে নবুয়তের প্রকাশ ঘটান, তেমনি গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কেবলা আলম ভাইদের সঙ্গে পারিবারিক ঘটনার বছরেই “বেলায়তের” বহিঃপ্রকাশ ঘটান। আহমদীয়ুল মশরবে নবী হিসেবে হযরত শীস (আঃ) পিতৃ ধর্মের অনুগামী এবং অনুসরণকারী হওয়ায় তিনি ছিলেন খাস আহল এবং অলদ। শায়খ উল আকবর হযরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ) হযরত শীস (আঃ) এর আধ্যাত্মিক এবং পারিবারিক জীবনে সংঘটিত ঘটনার আলোকে ঐশী দৃষ্টি শক্তির মাধ্যমে খাতেমুল অলদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। পিতা (আঃ) এর জন্য পাহাড়ের শীর্ষে উপবেশনের মাধ্যমে আল্লাহর কুদরতি ফল ফলারির অনুমোদন গ্রহণ করে হযরত শীস (আঃ) সর্বপ্রথম মান্না-সালওয়া পৃথিবীতে আনেন। মাইজভাগুর দরবার শরিফে পরম স্নেহধন্য ভ্রাতৃপুত্র বাবা ভাগুরী কেবলা আলমের প্রাথমিক রেয়াজতকালে গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কেবলা আলম জজব হালে স্বীয় আওলাদ এবং পরিজনদের জন্য মান্না সালওয়া অনুমোদনের বিষয়টি উল্লেখ করেন। মাইজভাগুর শরিফে অব্যাহত রিজিকের আনজাম হযরত কেবলা আলমের মান্না সালওয়া উল্লেখের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কেবলা আলমের সঙ্গে হযরত শীস (আঃ) এর অন্য একটি সাযুজ্য

হচ্ছে উভয়ই সাংসারিক কার্যাদিতে সম্পূর্ণ বিরত ছিলেন। শুধুমাত্র হেদায়তের বাণী প্রচার এবং আগন্তুকদেরকে আনুসঙ্গিক যুগোপযোগী দিক নির্দেশনা প্রদানের মধ্যে তাঁরা নিজেদের ইহজাগতিক কর্মধারাকে প্রবহমান রেখেছেন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কেবলা আলম ব্যতীত শায়খ উল আকবর বর্ণিত হযরত শীস (আঃ) এর বৈশিষ্ট্যাবলী অন্যকোন মহান আউলিয়ার জীবন প্রবাহে দৃশ্যমান হয়নি। ফসুসুল হেকমে হযরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী উল্লেখ করেছেন, “খাতেমুল অলদ হলেন বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদীর খাতেম। তিনি বংশগত এবং দেশগত হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইয়া ব্যক্ত হইবেন। ৫৯৫ হিজরী সনে আমার সঙ্গে (অর্থাৎ শেয়খুল আকবর) তাঁহার সাক্ষাত হয়। তাঁহার শরীরস্থ মোহরে বেলায়তের চিহ্ন তিনি আমাকে দেখান। তাঁহার খোদায়ী রহস্যপূর্ণ বাণী সাধারণ লোকেরা স্বীকার করিবে না। যদিও তাঁহার খাতেমে বেলায়তের চিহ্ন সাধারণ লোকের চক্ষুর অন্তরালে তথাপি আমার জামানাতেও তিনি বিদ্যমান আছেন।” হযরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবীর উপর্যুক্ত ভাষ্য অনুযায়ী বিশ্বাস করা যায় যে গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কেবলা আলম আহলে বায়েতের পবিত্র উত্তরাধিকার “সৈয়দ বংশ” শরাফতের দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। যে ভূখণ্ডে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, তা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল হিসেবে পরিচিত। শস্য শ্যামলা গিরি মেখলায় অত্যন্ত উর্বর এদেশে সামান্য পরিশ্রমে ফসল ফলফলাদি উৎপাদন করা যায়। এমন একটি দেশ পৃথিবীর বুকে খুঁজে পাওয়া বিরল। পৃথিবীতে প্রকাশিত হবার পূর্বে শেয়খুল আকবরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত ঘটে বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাস করা যায় যে গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কেবলা আলমের রুহানী তছরুফ বহুপূর্ব থেকেই বিদ্যমান। মুহাম্মদ-আহমদ নামের উজ্জ্বল অবয়বে খতমে বেলায়ত নিঃসন্দেহে সৃষ্টির শুরু থেকে বিদ্যমান ছিলেন। এ কারণে খাতেমুল আউলিয়া ঐ সময় হতে আউলিয়া, যেই সময় হযরত শীস (আঃ) পানি ও মাটির সাথে সংমিশ্রিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কেবলা আলমের হুজরা শরিফের সম্মুখের আম গাছ সম্পর্কে হযরত কেবলা আলম যে রহস্যপূর্ণ উক্তি করে পানি ঢালতে নির্দেশ দিয়েছিলেন—এর সঙ্গে শেয়খুল আকবরের মন্তব্যের গভীর সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। এ কথা অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ যে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কেবলা আলমের খোদায়ী রহস্যপূর্ণ বাণী তাঁর সমকালে অনুগ্রহ প্রাপ্ত খোদা প্রেমিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ স্বীকারও করেননি, বুঝেও উঠেননি। এখনও গাউসুল আযম মাইজভাগুরীকে অলি হিসেবে অনেকে স্বীকার করলেও তাঁর আবির্ভাবের মূল রহস্য অনেকের কাছে আসার হয়ে আছে। (চলবে)

সুন্নাহ-ভিত্তিক ইসলামে তাসাওউফের স্থান

মূল: শায়খ নূহ হা মিম কেলার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

অনুবাদ: কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

বর্তমান যুগে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন করার সম্ভবতঃ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সুন্নীপন্থী তথা ঐতিহ্যবাহী ইসলামী উলামাবৃন্দের অভাব। এ বিষয়ে ইমাম বোখারী (রহঃ) সহীহ সনদে বর্ণনা করেন মহানবী (দঃ)-এর একখানা হাদীস, যাতে তিনি ইরশাদ ফরমান:

“নিশ্চয় আল্লাহুতাল্লা ঐশী জ্ঞান তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে অপসারণ করেন না, বরঞ্চ তা অপসারণ করেন ইসলামী উলামাবৃন্দের রূহ (আঃ)-গুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে (বেসালপ্রাপ্তিতে), যতক্ষণ একজন আলেম-ও আর অবশিষ্ট না থাকেন; এমতাবস্থায় লোকেরা অজ্ঞ-মূর্খদেরকে তাদের (ধর্মীয়) ইমাম মেনে নেয়, যাদেরকে প্রশ্ন করা হলে না জেনেই ধর্মীয় বিষয়ে তারা ফতোয়া দেয়; ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ-পথভ্রষ্ট হয়, মানুষকেও পথভ্রষ্ট করে।” [ফাতহুল বারী, ১:১৯৪; হাদীস নং ১০০]

ওপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত প্রক্রিয়াটি এখনো সম্পন্ন হয়নি, তবে নিশ্চিতভাবে তার সূচনা হয়েছে। আর আমাদের এ জমানায় সুন্নীপন্থী উলামাবৃন্দের ঘাটতি, চাই তা ইসলামী বিধি-বিধান (ফিকাহ) ও হাদীস (মহানবীর বাণী) শাস্ত্রেই হোক, অথবা তাফসীর (কুরআন ব্যাখ্যাকারক) শাস্ত্রেই হোক, তা ধর্ম সম্পর্কে এমনই এক বোধ জাগিয়ে তুলেছে যা এতদসংক্রান্ত বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণতা হতে বহু বহু দূরে, এবং কখনো কখনো সত্য হতেও বহু দূরে। উদাহরণস্বরূপ, আমি ইসলামী বিধি-বিধান (ফিকাহ)-বিষয়ক জ্ঞানার্জনকালে প্রাচ্যবিশারদ ও মুসলিম-সংস্কারকদের লেখনীসমূহ হতে প্রাথমিক ধারণা যেটি পাই, তাতে মনে হয়েছিল মযহাবের ইমাম-মণ্ডলী বুঝি ইসলামী সুন্নাহর সম্পূর্ণ বাইরের এক ঝাঁক নিয়মকানুন নিয়ে এসে কোনো না কোনোভাবে মুসলমানদের ওপর তা চাপিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন আমি মধ্যপ্রাচ্যের সুন্নীপন্থী উলামাবৃন্দের সাথে বসে বিস্তারিত জানতে চাইলাম, তখনই আমি কুরআন ও সুন্নাহ হতে আইনকানুন বের করার ভিত্তি সম্পর্কে জানতে পেরে ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফিরলাম।

অনুরূপভাবে, তাসাওউফের ক্ষেত্রেও এই শাস্ত্রের উলামাবৃন্দের সাথে আমার বৈঠকে আমি পশ্চিমা বিশ্বে যা দেখতে পেয়েছিলাম, তার থেকে ভিন্ন একটি চিত্রের দেখা পেয়েছি। আজ রাতে আমার এ প্রভাষণে ইন্শাআল্লাহুতাল্লা আল-কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে এবং সিরিয়া ও জর্দানের প্রকৃত তাসাওউফ-শিক্ষকদের কাছ থেকে এতদসংক্রান্ত জ্ঞান ব্যাখ্যা করা হবে; এটি এ বিবেচনায় যে আমাদেরকে

গতানুগতিক ধারণার উর্ধ্বে ওঠা প্রয়োজন, আর ইসলামী উৎসগুলো হতে বাস্তব তথ্য জানা দরকার, যাতে এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর জানা যায় যে তাসাওউফ কোথেকে এসেছে? দ্বীন-ইসলামে এর ভূমিকা কী? আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এ জ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহুতালারই বা হুকুম কী?

তাসাওউফ শব্দটির উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, অন্যান্য অনেক ইসলামী বিদ্যাশাস্ত্রের মতোই এর নামটি প্রথম মুসলিম প্রজন্মের কাছে ছিল অপরিচিত। ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন তাঁর মোকাদ্দেমা গ্রন্থে এ বিষয়ে উল্লেখ করেন: এই জ্ঞান ইসলামী ঐশী বিধানেরই একটি শাখা যার উৎপত্তি উম্মতের মধ্য হতে হয়েছে। সূচনালগ্ন হতেই এ ধরনের পুণ্যাত্মাবৃন্দের পথকেও সত্য ও হেদায়াতের রাস্তা, সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ), তাঁদের দ্বারা প্রশিক্ষিত তাবেঈন ও তৎপরবর্তী সময়ে আগত তাবে তাবেঈনের তরীকাহ হিসেবে বিবেচনা করতেন প্রাথমিক যুগের মুসলমান সমাজ ও বিশিষ্টজনেরা।

এটি মূলতঃ ইবাদত-বন্দেগীতে নিবেদিত হওয়া, মহান আল্লাহুতালার প্রতি পূর্ণ উৎসর্গিত থাকা, দুনিয়ার তাবৎ চাকচিক্য হতে নির্মোহ হওয়া, অধিকাংশ মানুষের অশ্বেষিত আনন্দ-বিনোদন, ধনসম্পদ ও সুখ্যাতি পরিহার করা, অন্যদের থেকে দূরে সরে একাকী ইবাদত-বন্দেগী পালন ইত্যাদি রীতিনীতির সমষ্টি। এই ছিল মহানবী (দঃ)-এর সাহাবা-এ-কেরাম (রাঃ) এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের আচরিত সাধারণ/সার্বিক রীতি। কিন্তু ইসলামী দ্বিতীয় শতক হতে তৎপরবর্তী যুগগুলোতে মানুষের মাঝে যখন দুনিয়াবী মোহ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তখন যারা ইবাদত-বন্দেগীতে উৎসর্গিত হন তাঁদেরকে ‘সুফিয়্যা’ বা ‘মোতাসাউয়ীফ’ (তাসাউফপন্থী আলেম) নামে ডাকা হতো। [ইবনে খালদুন কৃত ‘আল-মোকাদ্দেমা’; মক্কা দারুল বায় কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত ১৩৯৭ হিজরী/১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ; ৪৬৭ পৃষ্ঠা]

ইবনে খালদুনের ভাষ্যমতে, “মহান আল্লাহুতালার প্রতি পূর্ণ উৎসর্গিত থাকা” মর্মে তাসাউফের সারকথা ছিল “মহানবী (দঃ)-এর সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের আচরিত সাধারণ/সার্বিক রীতি।” অতএব, এ পদটি প্রাথমিক যুগে অস্তিত্বশীল না থাকলেও আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে ইসলামী অনেক বিদ্যাশাস্ত্রের ক্ষেত্রে একই অবস্থা বিদ্যমান ছিল; যেমন তাফসীর (কুরআন-ব্যাখ্যামূলক জ্ঞান), কিংবা এলম আল-জারহ ওয়া তাদিল (হাদীস বর্ণনাকারীদের গ্রহণযোগ্যতায় প্রভাব বিস্তারকারক

ইতিবাচক ও নেতিবাচক উপাদানসমূহ), অথবা এলম আত তাওহীদ (ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসসংক্রান্ত জ্ঞান)। এসব জ্ঞানের শাখার সবগুলোই যে ধর্মের সঠিক সংরক্ষণ ও প্রসারে সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করেছে, তা আজ সপ্রমাণিত।

তাসাওউফ শব্দটির উৎস হয়তো সূফী শব্দ হতে, যা ওই পুণ্যাত্মাবৃন্দকে বোঝায় যারা তাসাওউফ অর্জন করেছেন। সূফী শব্দটির উৎপত্তি তাসাওউফেরও আগে। কেননা, ইমাম হাসান বসরী (রহঃ) যিনি ১১০ হিজরী সালে বেসালপ্রাপ্ত হন, তাঁর বক্তব্যে উভয় পদের মধ্যে সূফী শব্দটির উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন, “আমি এক সূফীকে কা’বা শরীফ তাওয়াফ করতে দেখে তাঁকে এক দিরহাম দিতে চাই। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি।” অতএব, তাসাওউফকে বুঝতে হলে সূফী কী তা জানতে চেষ্টা করাই মনে হয় সমীচীন হবে। আর হয়তো সূফী ও তাঁর পথ (তাসাওউফ-তরীকত), যা এই বিদ্যাশাস্ত্রের বুয়ূর্গবৃন্দ বেশির ভাগ সময়ই উল্লেখ করে থাকেন, তার সবচেয়ে যথাযথ সংজ্ঞাটি পাওয়া যায় মহানবী (দঃ)-এর সুন্নাহ থেকে, যাঁতে তিনি ইরশাদ ফরমান:

আল্লাহ্ পাক বলেন, “যে ব্যক্তি আমার ওলী (বন্ধু)-এর প্রতি শত্রুতাভাব পোষণ করে, তার বিরুদ্ধে আমি (আল্লাহ্) যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা আমার সান্নিধ্য অন্বেষণ করে আমারই পছন্দকৃত ফরয ইবাদতের মাধ্যমে; অতঃপর সে আমার সান্নিধ্য লাভ করে নফল (তরীকতের রিয়াযত তথা সাধনা) ইবাদত-বন্দেগী দ্বারা, যতোক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি। আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি, আমি তার শ্রবণশক্তি হই যা দ্বারা সে শোনে; তার দৃষ্টিশক্তি হই যা দ্বারা সে দেখে; তার হাত হই যা দ্বারা সে কাজ করে; তার পা হই যা দ্বারা সে চলাফেরা করে। সে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করলে নিশ্চয় (তৎক্ষণাত) আমি তা মঞ্জুর করি; সে আমার কাছে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে রক্ষা করি।” [ফাতহুল বারী, ১১:৩৪০-৪১, হাদীস নং ৬৫০২]

ওপরের এ হাদীসে কুদসী বর্ণনা করেছেন সর্ব-ইমাম বোখারী (রহঃ), আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ), আল-বায়হাকী (রহঃ) ও অন্যান্য আলেম-উলেমা, যা একাধিক অনুরূপ ইসনাদ দ্বারা সহীহ প্রমাণিত। এ রেওয়ায়াত বা বর্ণনাটি তাসাওউফের মৌলিক বাস্তবতা প্রকাশ করে, যা নির্ভুলভাবে বোঝায় পরিবর্তন; যে পরিবর্তনের পথকে সুন্নাহর সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মাশায়েখবৃন্দ সূফীর সংজ্ঞা হিসেবে বলেন, “ফাকিহুন আমিলা বি’ইলমিহী ফা আওরাসাহ্লাহ ইলমা মা লাম ইয়ালাম” অর্থাৎ, “শরয়ী বিধানে জ্ঞানী পুণ্যাত্মা যিনি যা জানেন তা-ই অনুশীলন করেছেন; অতঃপর আল্লাহ্ তাঁকে এরই ফলশ্রুতিরূপ দান করেছেন এমন জ্ঞান যা তিনি জানতেন না।”

তিনি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন, সূফী হচ্ছেন দ্বীনী জ্ঞানে আলেম-(এ-হক্কানী/রব্বানী)-বৃন্দ। কেননা ওপরের হাদীসে কুদসীটি ঘোষণা করে, “আমার বান্দা আমার সান্নিধ্য

অন্বেষণ করে আমারই পছন্দকৃত ফরয ইবাদতের মাধ্যমে”; জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই কেবল সূফী আল্লাহর আদেশ বা যা ফরয করা হয়েছে সে সম্পর্কে জানতে পারেন; তিনি যা জানেন তা-ই অনুশীলন বা প্রয়োগ করেন, কারণ হাদীসে কুদসীটি আরও বলে তিনি ফরয ইবাদতের মাধ্যমে কেবল আল্লাহর সান্নিধ্য অন্বেষণ করেন না, বরং “সে আমার সান্নিধ্য লাভ করে নফল (তরীকতের রিয়াযত তথা সাধনা) ইবাদত-বন্দেগী দ্বারা, যতোক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি।” আর এরই প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ্ তা’লা তাঁকে এমন জ্ঞান মঞ্জুর করেন যা তিনি জানতেন না। কেননা হাদীসে কুদসীটি আরও বলে, “আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি, আমি তার শ্রবণশক্তি হই যা দ্বারা সে শোনে; তার দৃষ্টিশক্তি হই যা দ্বারা সে দেখে; তার হাত হই যা দ্বারা সে কাজ করে; তার পা হই যা দ্বারা সে চলাফেরা করে।” এটি আসলে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব-সম্পর্কিত পূর্ণ সচেতনতাজ্ঞাপক একখানা রূপক, যেটি শ্রবণ, দর্শন, হাত দ্বারা কর্ম সম্পাদন ও পদচারণার মতো মানুষের কাজের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ সম্পর্কে আল-কুরআনে বিবৃত ওই বাণী উপলব্ধির সমষ্টিও, যে বাণী ঘোষণা করে “অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্মগুলোকেও” [সূরা সোয়াফ-ফাত, ৯৬ আয়াত; মুফতী আহমদ এয়ার খান (রহঃ) কৃত ‘তাফসীরে নূরুল এরফান]

বস্তুতঃ সূফী তরীকার উৎস নিহিত রয়েছে মহানবী (দঃ)-এর সুন্নাহতে। আল্লাহ্ তা’লার প্রতি একনিষ্ঠ বা নিবেদিত হওয়ার নিয়ম চালু ছিল প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মধ্যে। তাঁদের কাছে এটি ছিল নামবিহীন এক (আধ্যাত্মিক) অবস্থা। অন্যদিকে, মুসলমান সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যখন এই (আধ্যাত্মিক) অবস্থা থেকে দূরে সরে যান, তখন-ই এটি একটি স্বতন্ত্র বিদ্যাশাস্ত্রে পরিণত হয়।

এমতাবস্থায় পরবর্তী মুসলিম প্রজন্মগুলোর দ্বারা এ বিদ্যার্জনের জন্যে প্রয়োজন পড়ে এক পদ্ধতিগত প্রয়াসের। অধিকন্তু, প্রাথমিক প্রজন্মগুলোর পরবর্তীকালে ইসলামী পরিবেশে পরিবর্তনের কারণেই তাসাওউফ নামের এ বিদ্যাশাস্ত্র অস্তিত্বশীল হয়।

কিন্তু যদি এটি-ই প্রকৃত উৎস হয়, তাহলে আরও তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন দাঁড়ায়: ধর্মের কতোখানি মৌলিক বিষয় এ তাসাওউফশাস্ত্র? আর সামগ্রিকভাবে এটি দ্বীন-ইসলামে কোথায় খাপ খায়? সম্ভবতঃ এ প্রশ্নের সেরা উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় মুসলিম শরীফের একটি রেওয়ায়াতে, যাতে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বর্ণনা করেন :

“একদিন আমরা নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে হাজির ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন, যার কাপড় ধবধবে সাদা ও চুল গাঢ় কালো ছিল। তাঁর মধ্যে সফরের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিলো না এবং আমাদের কেউ তাঁকে চিনতেও পারছিলাম না। অবশেষে তিনি ছুঁর পাক (দঃ)-এর কাছে গিয়ে বসলেন এবং নিজের হাঁটুয়ুগল রাসূল

(দঃ)-এর বরকতময় হাঁটুয়ুগলের সাথে লাগিয়ে দিলেন, আর নিজ হাত নিজ উরুর ওপর রাখলেন। অতঃপর (তিনি) আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (দঃ)! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। জবাবে নবী করীম (দঃ) ইরশাদ করলেন, ইসলাম এই যে তুমি এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ (উপাস্য) নেই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর (প্রেরিত) রাসূল বা পয়গম্বর। অতঃপর নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোযা রাখবে, পবিত্র কাবার হজ্জ করবে, যদি সেখানে পৌঁছুতে পারো। (ওই ব্যক্তি) আরয করলেন, 'আপনি সত্য বলেছেন।' আমরা তাঁর ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হলাম এ কারণে যে তিনি ছয় পূর নূর (দঃ)-এর কাছে (প্রশ্ন) জিজ্ঞাসাও করেছেন এবং (এখন উত্তরের) সত্যায়নও করেছেন। তিনি আবার আরয করলেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। ছয় পাক (দঃ) ইরশাদ করলেন, 'আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা-মণ্ডলী, (আসমানী) কেতাবসমূহ, তাঁর রাসূলবৃন্দ এবং শেষ (বিচার) দিবসে বিশ্বাস করো। আর ভাল-মন্দ তাকদীরে বিশ্বাস করো।' (ওই ব্যক্তি) আরয করলেন, 'আপনি সত্য বলেছেন।' (তিনি) পুনরায় আরয করলেন, 'আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন।' মহানবী (দঃ) ইরশাদ ফরমালেন, আল্লাহর ইবাদত (আরাধনা) এভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছে। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে খেয়াল করো যে তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।' (ওই ব্যক্তি) আরয করলেন, 'কিয়ামত সম্পর্কে সংবাদ দিন।' রাসূলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করলেন, 'তুমি যাঁর কাছে জিজ্ঞেস করছো, তিনি কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক অবগত নন।' (প্রশ্নকর্তা আবার) আরয করলেন, 'কিয়ামতের কিছু নিদর্শন সম্পর্কে বলুন।' এবার ছয় পাক (দঃ) ইরশাদ করলেন, 'দাসী নিজ মালিককে প্রসব করবে, খালি পা, উলঙ্গ শরীরবিশিষ্ট দরিদ্র এবং মেষ-রাখালদেরকে বড় বড় দালানের জন্য গর্ব করতে দেখবে।' (বর্ণনাকারী হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন) অতঃপর ওই প্রশ্নকারী ব্যক্তি চলে গেলেন। আমি সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে সম্বোধন করে ইরশাদ ফরমালেন, 'হে উমর! তুমি কি জানো এই প্রশ্নকারী কে?' আমি আরয করলাম, 'আল্লাহ ও (তাঁর) রাসূল (দঃ)-ই ভাল জানেন। তিনি ইরশাদ করলেন, 'তিনি জিবরীল (আঃ); তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন।' [মূল: মুসলিম শরীফ; মুফতী আহমদ এয়ার খান কৃত 'মিরআত শরহে মিশকাত' ১ম খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা, 'ঈমান পর্ব'] এটি সহীহ হাদীস, ইমাম নববী (রহঃ) যেটিকে ইসলামের ভিত্তিস্বরূপ হাদীসগুলোর একটি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। 'আতাকুম ইউ'আলিমুকুম দীনাকুম' (জিবরীল তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন) এই শেষ বাক্যটি ব্যক্ত করে যে দ্বীন ইসলাম হাদীসটিতে বর্ণিত তিনটি মৌলিক বিষয়ের সমষ্টি: ১/ ইসলাম, অর্থাৎ, আমাদের প্রতি আল্লাহর

আদিষ্ট এতায়াত বা আনুগত্য; ২/ ঈমান, অর্থাৎ, আশ্বিয়া (আঃ) কর্তৃক প্রদত্ত অদৃশ্য বিষয়গুলোর সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন; এবং ৩/ ইহসান, অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী এমনভাবে করা যেন কেউ তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন। আল-কুরআনের সূরা মরিয়মে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন: "নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করেছি এই কুরআন এবং নিশ্চয় আমি নিজেই সেটির সংরক্ষক।" [আয়াত নং ০৯; মুফতী আহমদ এয়ার খান সাহেবের কৃত 'তাফসীরে নূরুল এরফান'] অতঃপর আমরা যখন আল্লাহতা'লার হেকমত তথা ঐশী জ্ঞান ও কৌশল সম্পর্কে চিন্তা করি এ মর্মে যে তিনি কীভাবে এই কুরআনকে সংরক্ষণ করেছেন, তখন আমরা দেখতে পাই যে (পুণ্যবান) সুন্নী উলামাবৃন্দ দ্বারা তিনি এটি করেছেন; যাঁদেরকে তিনি (হাদীসটিতে উলিখিত) ধর্মের প্রতিটি স্তরে কাজ করতে পাঠিয়েছেন। ইসলামের ক্ষেত্রে শরীয়তের ইমামবৃন্দ (আইম্মায়ে মাযাহিব); ঈমানের ক্ষেত্রে আকায়েদের ইমামবৃন্দ; এবং ইহসান মানে "আল্লাহর ইবাদত (আরাধনা) এভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছে", এ বিদ্যার ক্ষেত্রে তাসাওউফের ইমামবৃন্দ এ মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহর ইবাদত করো' হাদীসের এ বাণীটি নিজেই (ইসলামের) এই তিনটি মূল বিষয়ের (মানে ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের) আন্তঃসম্পর্ক আমাদের প্রদর্শন করে থাকে। কেননা, কীভাবে 'ইবাদত-বন্দেগী' করতে হবে সে সম্পর্কে জানা যায় শুধু দ্বীন-ইসলামের প্রকাশ্য বিধি-বিধান থেকে; পক্ষান্তরে, এই আরাধনার গ্রহণযোগ্যতার পূর্বশর্ত হচ্ছে আল্লাহতা'লা ও ইসলামের ঐশী বিধানের প্রতি ঈমান তথা বিশ্বাস পোষণ, যেটি ছাড়া ইবাদত স্রেফ শারীরিক কসরতে পরিণত হবে এবং ফলদায়ক বা গ্রহণযোগ্য হবে না; অপরদিকে, 'যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছে' এ কথাটি স্পষ্ট প্রতীয়মান করে যে ইহসান একটি মানবিক পরিবর্তনের সূচনাকারী, কারণ এতে নিহিত রয়েছে এমন-ই এক অভিজ্ঞতা যা আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ সঞ্চয় করেননি। তাই তাসাউফ-শাস্ত্রকে বুঝতে হলে ইসলাম ও ঈমানের প্রেক্ষাপটে এ পরিবর্তনের প্রকৃতিকে আমাদের অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করতে হবে; আর আজ রাতে এটি-ই হবে আমার আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ইসলামের পর্যায়ে আমরা বলেছিলাম যে 'খোদায়ী আজ্ঞার প্রতি সমর্পণের' মাধ্যমে তাসাউফের প্রয়োজন পড়ে দ্বীন-ইসলামকে; কিন্তু ইসলামেরও নিজস্ব প্রয়োজনে একইভাবে তাসাউফকে প্রয়োজন পড়ে। কেন? এটি এই সঙ্গত কারণে যে, মুসলমানদেরকে যে সুন্নাহ অনুসরণের আদেশ দেয়া হয়েছে, তা কেবল মহানবী (দঃ)-এর বাণী ও কর্ম-ই নয়, বরং তাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাঁর অন্তরের আহওয়াল তথা আধ্যাত্মিক অবস্থা, যেমন তাকওয়া বা খোদাভীরুতা, ইখলাস বা নিষ্ঠা, তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা, রাহমা বা করুণা, তাওয়াদু বা বিনয় ইত্যাদি গুণাবলী। (চলবে)

উসুলে সাবআ এবং “মাইজভাগুরী তরিকা”র স্বরূপ উন্মোচন : একটি পর্যালোচনা

॥ আলোকধারা ডেস্ক ॥

পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রকাশের সৃজনশীল বিকাশমান ধারায় শতাব্দীর পথ পরিক্রমায় স্থান, কাল, পাত্র ভেদে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরিকার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। এই প্রবহমান ধারায় সুদূর মক্কা-মদিনার ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে আমাদের ভারতবর্ষের এই ভূখন্ডেও অনেকগুলো তরিকার উদ্ভব ঘটেছে। ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ আইন-ই আকবরীতে ভারতবর্ষের ন্যূনতম ১৪টি তরিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এতে “বাংলাদেশ” নামক এই ভূখন্ডে স্বতন্ত্রভাবে কোন তরিকার উল্লেখ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশের মাটিতে একজন বাঙালি সুফিসাধক কর্তৃক একটি নতুন তরিকা প্রবর্তিত হয়েছে। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানায় ঐতিহাসিক মাইজভাগুর গ্রামকে কেন্দ্র করে এই তরিকার প্রচার ও বিকাশ বলে এ তরিকার নামকরণ হয় মাইজভাগুরী তরিকা।

অছি এ গাউসুল আযম মাইজভাগুরী হযরত আকদাস (কঃ)’র বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ও ঘটনার প্রেক্ষিতে উচ্চারিত মহান কালাম সমূহ ও জীবনাদর্শ তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকা ও ফয়েজপ্রাপ্ত বিশিষ্ট খলিফা কর্তৃক বর্ণিত হযরত আকদাস (কঃ) সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও লিখিত পুস্তক এবং প্রামাণ্য দলিলসমূহ তাঁর রহস্যপূর্ণ কারামাতসমূহ এবং তাঁর সম্পর্কে অছি এ গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রভৃতিকে অবলম্বন করে। তিনি সর্বপ্রথম মাইজভাগুরী দর্শনের লিখিত মডেল প্রদান করেন। প্রকাশ করেন বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থটি। যেটি মাইজভাগুরী দর্শনের একমাত্র মুখপত্র। যার মাধ্যমে মাইজভাগুরী দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়। ১৪৪ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে ২৬টি আরবি ও ফার্সী এবং ৩টি বাংলা রচিত গ্রন্থ থেকে দলিল প্রমাণাদি সংগ্রহ করেন এবং ১৫টি পরিচ্ছেদ ৬৩টি বিষয় নিয়ে গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা এই গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। নবুয়ত, বেলায়ত, গাউসিয়ত, কুতুবিয়ত ইত্যাদির আলোচনা এবং এই প্রেক্ষাপটে বেলায়তে মোতলাকার যুগ, গাউসুল আযম মাইজভাগুরী (কঃ) আবির্ভাব তাঁর বর্ণনা তদীয় মাইজভাগুরী তরিকার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মাইজভাগুরী তরিকার বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এ তরিকার প্রয়োগিক দিক মাইজভাগুরী দর্শনের সাতটি ধাপ বা সিঁড়ি যা উসুলে সাবআ বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি নামে অভিহিত। যা বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থে ৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে একটু বর্ণনা করছি।

১। ফানা আনিল খাক বা আত্মনির্ভরতা : কারো নিকট কোনরূপ উপকারের আশা বা কামনা না থাকা। যার ফলে মানব মন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজ শক্তি সামর্থের প্রতি আস্থা জন্মে। যার ইশারায় গাউসুল আযম মাইজভাগুরী বলেছেন “নিজের হাতে পাকাইয়া খাও, পরের পাকানো খাইওনা”।

২। ফানা আনিল হাওয়া বা অনর্থ পরিহার : যা না হলে চলে, সেরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা। যার ফলে জীবনযাত্রা সহজ ও ঝামেলা মুক্ত হয়। যার প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত আকদাস বলেন- “এখানে হাওয়া (অনর্থক প্রবৃত্তিকে) দাফন করা হইয়াছে।” তাই অছি এ গাউসুল আযম মাইজভাগুরী লিখেন- “অনর্থেরই পরিহারে তাকওয়ার ঝলক দেখেছি, পরণেতে অলির পরণ পস্থা নির্দেশ দিতেছি।”

৩। ফানা আনিল এরাদা বা প্রবৃত্তি প্রসূত ইচ্ছার বিনাশ : খোদার ইচ্ছা শক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া এবং নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলীন করা যার ফলে সূফি মতে “তছলীম ও রাজা” হাসিল হয়। তার ইঙ্গিতে গাউসুল আযম মাইজভাগুরী বলেন- একদিন ঝড়ের সময় বাতাসে ঘর পড়ে যাচ্ছে দেখে মা [হযরত আকদাস (কঃ) এর সম্মানিত জননী] ঘরের উত্তর দিকে ঠেস (খুঁটি) দিতে বললে, গাউসুল আযম মাইজভাগুরী দক্ষিণ দিক থেকে ঠেলতে শুরু করেন এবং মায়ের প্রশ্নের উত্তরে বলেন- উত্তর দিকে ঠেস দিলে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা হবে।

৪। মউতে আব্ব্যাজ বা সাদা মৃত্যু : এটা উপবাস বা সংযমে আয়ত্ত হয় যার ফলে মানব মনে আলো বা উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। যার ইঙ্গিতে গাউসুল আযম মাইজভাগুরী বলেন, “আমি বার মাস রোজা রাখি, তুমিও রাখিও। আমার ছেলেরা সারা বছর রোজা রাখে।”

৫। মউতে আসওয়াদ বা কালো মৃত্যু : এটা শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দাতে হাসিল হয়। যার ইঙ্গিতে গাউসুল আযম মাইজভাগুরী বলেন- “মিয়া বাহাস করিওনা, আপন হালতে থাকিয়া যাও”। অছি এ গাউসুল আযম মাইজভাগুরী বলেছেন- “বাক বিতন্ডা পরিহারে জানার আত্মহে”।

বাবা ভান্ডারীর অন্যতম আশেক ফকির রমেশ শীল বলে-

“শুন যত বন্ধুগণ নিন্দুকেরে তোমরা কভু ভেবোনা দুশমন
তারা তরিকতে ধোপার মত ধুয়ে করুক পরিষ্কার
নিন্দা করলে কী ক্ষতি আমার।”

৬। মউতে অহমর বা লাল মৃত্যু : এটা কামভাব ও লালসা হতে মুক্তিতে হাসিল হয়। যার ইঙ্গিতে গাউসুল আযম

মাইজভাণ্ডারী বলেন- “কবুতরের মত বাছিয়া খাও, হারাম খাইওনা”। “নিজের হাতে পাকাইয়া খাও, পরের হাতে পাকানো খাইওনা। আমি বার মাস রোজা রাখি, তুমিও রাখিও” “আমার ছেলেরা বার মাস রোযা রাখে” “দুনিয়া মুসাফিরের জায়গা, এখানে আড়ম্বরের দরকার কি?”

৭। মউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যু : নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলে এটা হাসিল হয়। যার ফলে মানব অন্তরে স্রষ্টার প্রেম ভালবাসা ছাড়া অন্য কামনা বাসনা থাকে না। যার ইঙ্গিতে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী বলেন- “ফেরেস্টা কালেব বনিয়া যাও। নিজ সন্তান-সন্ততি নিয়া খোদার প্রশংসা কর।” যার ইশারায় খলিফায়ে গাউসুল আযম হযরত আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী লিখেন-

তোমারি প্রেমেতে মজে ইষ্ট মিত্র সবি ত্যাজে
সাধের ভূষণ করিয়াছি কলংকেরি হার
তোমারি না পাইলে আমার জীবন অসার”

রমেশ শীল বলেন-

মানুষ ধরার কল বসাইল আমার বাবা ভাভারী
ঐ কলেতে পরলে ধরা তার থাকে না ঘর বাড়ি”

অছি এ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী তার মূলতত্ত্ব গ্রন্থে লিখেছেন- একজন মানুষ ইনসানে কামিল হওয়ার জন্যে নফসের সাতটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। এগুলো হলো নফসে আন্নারা, লাওয়ামা, মোলহেমা, মোতমাইন্যা, রাজিয়া, মর্জিয়া, কলেমা। এই বই পড়লে একজন মানুষ অবশ্যই বুঝতে পারবে সে কোন নফসের মধ্যে বসবাস করছে এবং এখান থেকে উত্তরণের উপায় কী? এখানে আমি শুধু নফসে আন্নারা সম্পর্কে বর্ণনা করছি।

(ক) এর জন্যে খোদা অবতীর্ণ ধর্ম শরীয়ত অর্থাৎ নবীগণ কর্তৃক বর্ণিত আদেশ নিষেধ মূলক ইবাদতে মোতনাফিয়া বা পাপকার্য বিরতবাদী ইবাদত করে।

(খ) অবস্থান ক্ষেত্র : নাছুত বা দৃশ্য জগত।

(গ) প্রেরণ : পানাহার, ফুর্তি ও সহবাস করা।

(ঘ) স্বভাব : হিংসা, নিন্দা, ঈর্ষা, কৃত্রিমতা, ক্রোধ ইত্যাদি।

(ঙ) মুক্তির জিকির : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

(চ) জিকির সংখ্যা : পাঁচ লাখ পর্যন্ত।

(ছ) যাতে ফানা আনিল খান্নক হাসিল হয় এবং ফানা আনিল হাওয়া, ফানা আনিল এরাদা আয়ত্ত্ব হয়।

এভাবে তিনি একজন মানুষ কিভাবে কামেল হবে তার সূত্র উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য যে, মাইজভাণ্ডারী ছেমা অনুষ্ঠানে বেশির ভাগ সময় গাওয়া হয় মওলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী রচিত গান-

দমে দমে জপরে মন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
ঘটে ঘটে আছে জারি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
সপ্ত রঙ্গের টঙ্গি বিচে, রুহ ধন কামিনি নাচে

প্রেমেতে বিভোর জপ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”
ফকির রমেশ শীল বলেন-

শুন বন্ধুগণ এবার বুঝ দমের আলামত
দমের ঘরে নিত্য ফিরে দমে করে এবাদত
ভোজনে ১৮ আঙ্গুল, ২৪ আঙ্গুল গমনে
নিদ্রাতে ৬২ আঙ্গুল, ৮৪ আঙ্গুল রমণে
২১৬০০ ভাবে দিবারাত্রি গতাগত
এবার বুঝ দমের আলামত”

এই যে খলিফায়ে মাইজভাণ্ডারী গানের মাধ্যমে নফস আন্নারা থেকে কিভাবে উত্তরণ হবে তার নির্দেশনা দিয়েছে এভাবে। যা অছি এ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক সম্পাদিত ফানা আনিল খান্নক।

এই দর্শন প্রকাশের ফলে সকল বুদ্ধিজীবী ও ইসলামী গবেষকদের মন থেকে মাইজভাণ্ডারী দর্শন সম্পর্কে সকল প্রকার ভ্রান্ত ধারণা বিভ্রান্তি ও ভুল বুঝাবুঝি তিরোহিত হয়। যার প্রমাণ তার প্রসঙ্গে স্বনামধন্য ঐতিহাসিক বিদ্বন্ধ পন্ডিত ড. আবদুল করিম বলেন- আমার বিবেচনায় তাঁর [সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)] রচিত বেলায়তে মোতলাকাসহ ছোট বড় ডজন খানেক গ্রন্থ অপ্রকাশিত লেখালেখি ও ব্যক্তিগত ডাইরী মাইজভাণ্ডারী দর্শনের এক মহামূল্যবান সম্পদ। বিভ্রান্তির নানা ডামাডোলের মধ্যেও প্রকৃত মাইজভাণ্ডারীকে জানা ও বুঝার ক্ষেত্রে এগুলো দিকদর্শন ও ধ্রুবতারা স্বরূপ” ইমামে আহলে সুন্নত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রঃ) বলেন- আমি আশা করি কেতাবিটি (বেলায়তে মোতলাকা) উচ্চ শ্রেণীর তরিকত পন্থীর জন্যে বিশেষ উপকারে আসিবে।” অছি এ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)’র দর্শন উপস্থাপন ইসলামি ইতিহাসের কোন নতুন ঘটনা নয়। পবিত্র ইসলাম ধর্মেও যুগে যুগে অনেক তরিকায় এই রকম গুরুত্বপূর্ণ কাজ সংঘটিত হয়েছে, তাদের যোগ্য উত্তরসূরি দ্বারা।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ওফাত হওয়ার পূর্বে আজকের দিনের মত পবিত্র কুরআন শরীফ এর একত্রিত কোন লিখিত রূপ ছিল না। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) কে অনেকে এই কোরআন সংকলনের জন্যে বললে তিনি রাসূল পাক (দঃ) করেননি বিধায় তা করতে অস্বীকৃতি জানান, তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের আমলে এই কুরআন সংকলিত হলেও আজ পর্যন্ত কেউ এটাকে বেদাত বলতে পারেনি।

রাসূল পাক (দঃ) ওফাতের অনেক বছর পর ইমাম বুখারী ২১৭ হিজরী সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে মক্কার হারাম শরীফে হাদিস গ্রন্থের সংকলন শুরু করেন। পবিত্র কুরআনের পর এই গ্রন্থের স্থান। দীর্ঘ দিন পর এটি রচনা করা হলেও আজ পর্যন্ত এটির গ্রহণযোগ্যতা ইতিহাস খ্যাত। আর ইসলামে হাদিস বা

হাদিস শাস্ত্র বলা হয় সেই জ্ঞান সম্পর্কে যার সাহায্যে রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর কথা কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। যে কাজ তাঁর উপস্থিতিতে সম্পাদন করা হয়েছে কিন্তু তিনি তা নিষেধ করেন নি এমন কাজও হাদিসে অন্তর্ভুক্ত। হাদিস শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। এক ইলমে রাওয়ায়েতুল হাদিস, দুই ইলমে দেয়াতুল হাদিস।

যেহেতু যে কাজ রাসূল (দঃ) এর উপস্থিতিতে সম্পাদন করা হয়েছে কিন্তু তিনি তা নিষেধ করেন নি এমন কাজও হাদিসে অন্তর্ভুক্ত অথচ হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী যে দর্শন রচনা করেছেন- হযরত আকদাস (কঃ)'র প্রতিটি বাণী কথাবার্তা ও প্রত্যক্ষ উপলক্ষির মাধ্যমে। তিনি বর্ণনা করেন- “আমি হুজুর আকদাস হযরত শাহসূফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) সাহেবের অনুগ্রহ ও খেদমত, সোহবতের ফয়জ বরকতপ্রাপ্ত এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের অধিকারী বংশধর তাহার একমাত্র পুত্র সন্তান মাওলানা সৈয়দ ফয়জুল হক মরহুম শাহ সাহেবের একমাত্র বিদ্যমান পুত্র এবং হযরত আকদাসের সাজ্জাদানশীন বিধায় নৈতিক দিক দিয়া এই বেলায়তের স্বরূপ উদঘাটন রূপ দুঃসাহসী কাজে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইলাম। লেখকের এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে মাইজভাগুরী দর্শন উপস্থাপন করার জন্য হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব।

কুরআন পাকে যে লিখিত হেদায়েত বিদ্যমান আছে সেই দিকে খুব কম সংখ্যক লোকেরাই সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ”। বস্তুত খুব কম সংখ্যক লোকেরই সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে বর্তমানে মাইজভাগুরী দর্শনের দিকে, আমরা কতজনেই বা এই দর্শন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করি?

ইতিহাসে দেখা যায় যে আবুল হাসান আস শাজিলী (পুরো নাম আবু আল হাসান আলী ইবনে আবুদ আল্লাহ ইবনে আবদ আল জাব্বার আল হাসানী ওয়াল হোসাইনী আস শাজিলী। যিনি শেখ আকল শাজিলী নামেও সুপরিচিত।) জন্ম ৫৯৩ হিজরী, ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দে। ইন্তিকাল ৬৬৫ হিজরী, ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে। উত্তর আফ্রিকার একজন প্রভাবশালী ইসলামী পন্ডিত ও সূফি সাধক ছিলেন। তিনি শাজিলী তরিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, তিনি এই তরিকার কোন রীতি পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করে যান নি। যা লিখেছেন ঐ তরিকার তৃতীয় মুরশিদ ইবনে আতা আল্লাহ আল ইস্কান্দারী (কঃ) (জন্ম- ৬৫৮ হিজরী, ১২৫৯ খ্রিষ্টাব্দে, ইন্তিকাল- ৭১৯ হিজরী, ১৩১০ খ্রিষ্টাব্দে) ইবনে আতা আল্লাহ আল ইস্কান্দারী আল শাজিলী ছিলেন শাজিলী সূফি তরিকার তৃতীয় মুরশিদ। তিনি শাজিলী তরিকার নীতিমালা (Doctrines) কে সুশৃঙ্খল ও সুসংহত করেন এবং শাজিলী তরিকার প্রতিষ্ঠাতা আবুল হাসান আল

শাজিলী এবং তাঁর উত্তরসূরী আবু আল আব্বাস আল মুরসীর জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। তিনি জিকিরের উপর মুক্তির চাবি (মিফতাহ আল ফালাহ) শীর্ষক প্রথম সুবিন্যস্ত গ্রন্থ রচনা করার কৃতিত্বের দাবিদার। এছাড়াও তিনি শাজিলী তরিকার প্রতিষ্ঠাতার সারগর্ভ বাণী সমূহ কিংবা অমূল্য উপদেশাবলী সম্বলিত “হিকাম আল আতাইয়া” শীর্ষক সংকলন গ্রন্থের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। শাজিলী তরিকার বেশ কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ পীর যথাক্রমে ইবনে আব্বাস আল রুন্দী, আহমদ জাররুক, আহমদ ইবনে আজিবা প্রমুখ এবং শাজিলী তরিকার অনুসারী নয় এমন গবেষকগণ যথা ইসলামী আইনের অধ্যাপক সাঈদ রামাদান আল বুঁতি উক্ত সংকলন গ্রন্থটির উপর মূল্যবান মন্তব্য (Comment) প্রদান করেছেন।

ইবনে আতাউল্লাহ লিখিত বই পুস্তকের বহুল প্রচারের ফলে উত্তর আফ্রিকাতে শাজিলী তরিকা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। অথচ ইতোপূর্বে বার বার মৌখিকভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও এ অঞ্চলের লোকজন শাজিলী তরিকার প্রতিষ্ঠাতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তিনি ১৩১০ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোতে ইন্তেকাল করেন। উল্লেখ্য যে ইবনে আতা আল্লাহ আল ইস্কান্দারী লিখিত কিতাব সম্পর্কে যেমন শাজিলী তরিকার সুপ্রসিদ্ধ পীর ছাড়াও ঐ তরিকার অনুসারী নয় এমন গবেষকগণ উক্ত সংকলন গ্রন্থটির উপর মূল্যবান মন্তব্য প্রদান করেছেন ঠিক একইভাবে অছি এ গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কর্তৃক প্রকাশিত বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থেও মাইজভাগুরী ঘরানার পীর ছাড়া আরো অনেকে মূল্যবান মন্তব্য করেন।

প্রভাবশালী ইসলামী সূফী তরিকাসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নকশবন্দী তরিকা। এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন হযরত বাহা উদ্দীন নকশবন্দী বুখারী (রঃ)। (জন্ম ১৩১৮ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) বাহাউদ্দীন নকশবন্দী বুখারীর জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে অনেক তথ্য তখনও অজানা। এর প্রধান কারণ হল তিনি তাঁর কোন কর্ম কিংবা বাণীসমূহ তাঁর অনুসারীদেরকে তাঁর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন। এই নকশবন্দী তরিকার মূলনীতি বা উসুল হচ্ছে ১১টি। শেখ বাহাউদ্দীন নকশবন্দী পীরি সজরাব ১১তম পীর হযরত আবদুল খলিফা গার্জওয়ামা (জন্ম- ১০৪৪ খ্রিষ্টাব্দ, ইন্তিকাল ১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে নকশবন্দী তরিকার ৮ মূলনীতি গ্রহণ করা হয়। [উল্লেখ্য যে হযরত আবদুল খালিক গাজওয়ানী (রঃ), রাসূল পাক (দঃ) থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হয়ে ১১তম পীর ছিলেন বাহাউদ্দীন নকশবন্দী উক্ত সিলসিলার ১৭তম পীর ছিলেন।] এই ৮ মূলনীতির সাথে বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (রঃ) আরও ৩ নীতি যুক্ত করে প্রদান করেন নকশবন্দী তরিকা। এই ১১ মূলনীতি বা উসুলকে ‘কালিমাতি কুদসিয়া’ বলা হয় নকশবন্দী তরিকায় ১১ নীতিকে সংক্ষেপে উল্লেখ্য কটি [বিস্তারিত জানার জন্য

পাঠকদের উইকিপিডিয়া দেখার জন্য অনুরোধ রইল—

(১) যিকির বা স্মরণ (২) আত্মসংযম যিকিরকারী মনে মনে পবিত্র শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করবেন (৩) সতকর্তা সাবধানতা বা মনোযোগপূর্ণতা (৪) স্মরণ করা (৫) নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা অথাৎ মুরিদ বিনা যিকিরে একটি নিশ্বাসও গ্রহণ বা ত্যাগ করবেনা (৬) নিজ বাসগৃহে ভ্রমণ এটা হলো দেহাভ্যন্তরে ভ্রমণ (৭) প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতি মনোযোগী থাকা (৮) জনবহুল স্থানে থাকলেও একাকী অবস্থান। (৯) সময় সম্পর্কে সচেতনতা (১০) সংখ্যার হিসাব রাখা অর্থাৎ ক্বলবে কতবার জিকির হচ্ছে তার হিসাব সংরক্ষণ করা। (১১) ক্বলবে আল্লাহর নাম অঙ্কিত করা প্রকৃতপক্ষে ‘নকশবন্দ’ শব্দের অর্থই হলো ক্বলবে বা অন্তরে আল্লাহর নামের নকশা স্থাপন করা।

অনেকে বলে থাকেন অছি এ গাউসুল আযম মাইজভাগুরী কর্তৃক প্রকাশিত মাইজভাগুরী দর্শন সম্পর্কে পূর্বেও অনেক সূফিগণ লিখেছিলেন। এটি নতুন কিছু নয় তখন তাদেরকে বলতে ইচ্ছে করে নকশবন্দ তরিকার ৮টি মূলনীতি অপরিবর্তিত ভাবে নেওয়া হয়েছে হযরত আবদুল খালিক গাজওয়ানী (কঃ) থেকে তাহলে কি আমরা নকশবন্দ তরিকাকে তরিকা বলবনা?

অছি এ গাউসুল আযম মাইজভাগুরী “মাইজভাগুরী দর্শন” তথা বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন “এ বইয়ের সত্য কেউ খন্ডাতে পারবে না। বিশ্বের আলেম সমাজের প্রতি চ্যালেঞ্জ রইল ইহ ও পর উভয় জগতের সকল সমস্যার সমাধান এতে রয়েছে, গাধার চোখ দিয়ে নয় অন্তরের চোখ দিয়ে খুঁজতে হবে”। এই মাইজভাগুরী দর্শন সম্পর্কে এক আলাপচারিতায় মহান মনিব মওলা মাইজভাগুরী (ম.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন হানাফী মাযহাবের রীতি পদ্ধতিগুলো কি রাসুল পাক (দঃ) এর জামানায় ছিল? আমি একটু গাধা প্রকৃতির ছেলে তাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম না। তখন বাবাজান বলেন— “তখন এই রীতিপদ্ধতিগুলো ছিল। যদি না থাকে তাহলে আমরা এখন এগুলো অনুসরণ করব কেন? তখন ঠিকই ছিল কিন্তু লিখিতভাবে উপস্থাপিত ছিল না। ইমাম আবু হানিফা যা লিখিত রূপ প্রদান করেন। ঠিক একই ভাবে মাইজভাগুরী দর্শন ও হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর জামানায়ও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু লিখিত আকারে ছিল না, যা অছি এ গাউসুল আযম লিখিত রূপদান করেন। এখন যদি কেউ বলে আমি এই মাজহাব মানিনা কারণ এটি রাসুল পাক (দঃ) কর্তৃক লিখিত নয় তাহলে কেমন হবে, পাঠকের কাছে প্রশ্ন রইল। ঠিক একইভাবে অছি এ গাউসুল আযম মাইজভাগুরী, মাইজভাগুরী পরিমণ্ডলে হযরত উসমান (রাঃ), হযরত ইমাম বুখারী (রঃ), হযরত আবু হানিফা (রঃ), হযরত ইবনে আতাউল্লাহ আল ইস্কান্দারী

(রঃ), হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ বুখারী (কঃ) এর মত দায়িত্ব পালন করেন। বংশগতভাবে ও সাহচর্যের দিক থেকে উপরে উল্লেখিত কারো কারো চেয়ে উনি আরো বেশি দর্শন জনকের একান্ত কাছের ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

মহৎ ও বরণ্য মানুষের পক্ষেই কাল কালান্তরের জন্য শিক্ষামূলক কিছু রেখে যাওয়া সম্ভব। সাহসীরাই ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারে কর্মকীর্তি ও বাণী। ভীরু ও কাপুরুষের পক্ষে তেমন মহৎ কিছু করা হয় না। মাইজভাগুরী দর্শনের লিখিত রূপ প্রদান করে অছি এ গাউসুল আযম মাইজভাগুরী (কঃ) বীরত্বপূর্ণ এক দুঃসাহসিক কাজ সম্পাদন করেন। আর বীরত্ব ও সাহসই হচ্ছে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের ভূষণ। তাঁর সম্পাদিত এই মাইজভাগুরী দর্শন আজ বিশ্বের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকগণের গবেষণার বিষয়। এই গবেষণা মিসরের আল আজহারের পণ্ডিত থেকে শুরু করে জার্মানীর প্রখ্যাত গবেষক হ্যান্স হার্ডার হয়ে বাংলাদেশের বড় বড় ডক্টরেটগণও গবেষণা করে নিত্য হচ্ছেন হয়রান। এছাড়াও আমাদের মত কত জ্ঞানহীন মূর্খরাও এই সপ্ত পদ্ধতিতে পায় শান্তির সুশীতল ছায়া। একমাত্র আশ্রয় স্থান, বিশ্বাসের বস্তু। এখন কেউ যদি বিতর্ক জুড়ে দেন তখন তাদের কাছে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে তাহলে মাইজভাগুরী দর্শনটা কী? এর চেয়ে ভাল কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা আপনাদের কাছে আছে কি? থাকলে উপস্থাপন করবেন কি?

ঋণ স্বীকার:

০১। বেলায়তে মোতলাকা

রচয়িতা: খাদেমুল ফোকরা সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ)।

০২। মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার (প্রথম খন্ড)

রচয়িতা: খাদেমুল ফোকরা সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ)।

০৩। শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী (কঃ), জীবনী গ্রন্থ রচয়িতা: জামাল আহমদ সিকদার।

০৪। প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রবন্ধ: মাইজভাগুরী দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ.... ও মুর্শিদে কামিল হযরত মাওলানা শাহসূফি সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ), মাসিক আলোকধারা, জানুয়ারী ২০১৫।

০৫। ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, প্রবন্ধ: মাইজভাগুরী তরিকার তাত্ত্বিক বিশ্লেষক সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ), মাসিক আলোকধারা, মার্চ ২০১৪।

০৬। ড. মাওলানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ, প্রবন্ধ: রমজান ও রোজার ফযিলত, মাসিক আলোকধারা, জুন ২০১৬।

০৭। ড. মাহফুজ পারভেজ, প্রবন্ধ: আলেকজান্ডার ও ভলতেয়ারের উক্তি, দৈনিক পূর্বকোণ, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

০৮। দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬, আন্তর্জাতিক ডেস্ক।

তাওহীদের সূর্য : মাইজভাণ্ডার শরীফ এবং বেলায়তে মোতলাকার উৎস সন্ধানে

• জাবেদ বিন আলম •

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাওহীদ প্রচারের কৌশল:

মহানবীর (দঃ) নবুয়ত প্রকাশের পর তাওহীদের বাণী শুনে কোরাইশরা আতংকিত হয়ে পড়ে। কলেমা তৈয়বায় স্পষ্টভাবে একক অবিনশ্বর সত্তা (ইলাহ) এবং তাঁর মনোনীত রাসূল মুহাম্মদ (দঃ) এর উপর ঈমান আনয়ন এবং আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশনা রয়েছে। কলেমা তৈয়বার এ নির্দেশনা কোরাইশদের সনাতন ধর্ম বিশ্বাসের পুরোপুরি বৈরী হওয়ায় তারা তাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রিয়জন 'মুহাম্মদ' এর ধর্মের প্রতি অশোভন উক্তি প্রকাশ করতে থাকে। মক্কা নগরীকে বদমায়েশ ও বর্বর মুক্ত করার জন্য গঠিত হিলফুল ফুজুল অকার্যকর করে গোত্রনেতারা মহানবীকে (দঃ) তাদের একমাত্র প্রধান শত্রু ঘোষণা দেয়। এ ধরণের বৈরী পরিস্থিতির মধ্যেও মহানবী (দঃ) ছিলেন তাদের নিকট 'আল্ আমিন' বা সর্বোত্তম বিশ্বস্ত ব্যক্তি। মক্কার সকল ব্যক্তি অর্থ সম্পদসহ সকল প্রকার সম্পত্তি মহানবীর (দঃ) নিকট প্রবল আস্থাসহকারে জমা রাখতেন। এমনকি নবুয়ত ঘোষণার পরেও ভিন্ন মতাবলম্বী কাফির মুশরিকরা সম্পদ জমা রাখার ক্ষেত্রে মহানবীর (দঃ) উপর বিদ্যমান আস্থায় কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় প্রকাশ করেনি। মহানবী (দঃ) হযরতের উদ্দেশ্যে মদীনা গমনকালে তাঁর নিকট আমানত হিসেবে গচ্ছিত থাকা মক্কার ব্যক্তিবর্গের সকল সম্পদ যথাযথভাবে ফেরত দানের লক্ষ্যে হযরত আলীকে (রাঃ) দায়িত্ব প্রদান করেন। হযরত আলী এ সকল আমানত প্রাপকদের নিকট হস্তান্তর করে মহানবীর (দঃ) নির্দেশনা অনুযায়ী মদীনায় হিজরত করেন। এ বিষয়ে ইসরাইলী মহিলাদেরকে বিভিন্ন আনন্দ উৎসবে ব্যবহারের জন্য ধার হিসেবে প্রদত্ত গয়না অলংকারাদি কিবতীদেরকে ফেরত না দিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়। উল্লেখ্য যে, এ ঘটনা হযরত মুসা (আঃ) এর অগোচরে সম্পন্ন হয়েছিল। মহান আল্লাহ্ বনি ইসরাইলী মহিলাদের এ কর্ম সমর্থন করেননি। আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী এ সকল গয়না একত্রিত করে আগুনে ভস্মীভূত করা হয়। ইসরাইলীদের ফিতরতের সঙ্গে এখানে মহানবীর (দঃ) ফিতরতের উৎসগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আরবের লোকজনের নিকট মহানবী (দঃ) পরম সত্যবাদী এবং হাজারে

আসওয়াদ (কালো পাথর) কাবা শরীফে পুনঃস্থাপনের বিষয়ে ঐক্যের প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও তাওহীদের ঘোষণা এবং নবুয়ত দাবী করা প্রসঙ্গে আরবরা মহানবীকে স্বীকার করে নেয়নি। বরং নানা রকম কূটকৌশল অবলম্বন করে তাওহীদ প্রচার এবং নবুয়ত ঘোষণার বিরোধিতা করতে থাকে। এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছিত যে আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রচার সম্পর্কে মহানবীর (দঃ) মতো এতো বেশী বাধা বিঘ্ন বিপত্তি এবং নির্যাতনের মুখে অন্য কোন নবী পতিত হননি। অবশ্য অন্য কোন নবী তাওহীদ প্রচারে স্বল্পতম সময়ে এতো অধিক মাত্রায় সফল হননি। মহানবী (দঃ) প্রথম দিকে স্বীয় আত্মীয় পরিজনের নিকট তাওহীদের মর্মবাণী এবং 'কলেমা তৈয়বা' ঘোষণা করলে স্বজনরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে অতি গোপনে তিনি তাওহীদের বাণী প্রচারের লক্ষ্যে তিন বৎসরব্যাপী ক্ষেত্র প্রস্তুতে তৎপর থাকেন। নবুয়ত প্রকাশের পূর্ব থেকেই মহানবী (দঃ) হানীফি ধর্মাবলম্বীদের [হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ধর্ম] সঙ্গে পরিচয় এবং গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এদের একজন ছিলেন যাইদ বিন আমর। তিনি আশারায়ে মোবাশশারা হযরত সাইদ বিন যাইদের পিতা। এছাড়া অসহায় নির্যাতিতদের সর্বাবস্থায় সাহায্য সহযোগিতা করার কারণে মহানবী (দঃ) এর প্রতি সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের বিশেষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা পায়। আল্লাহ্র একত্ববাদ এবং মহানবীর (দঃ) নবুয়তের প্রতি সর্বপ্রথম আনুগত্য প্রকাশ করেন হযরত খাদিজা (রাঃ)। এরপর হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত যায়েদ। আত্মীয় পরিজনের বাইরে প্রথম ঈমান আনেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। কিশোর বয়স থেকে হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন মহানবীর (দঃ) একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু এবং হিলফুল ফুজুলের সদস্য। হযরত আবু বকর (রাঃ) অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যবসায়ী হিসেবে বিত্ত সম্পদের অধিকারী হওয়ায় সর্বমহলে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। মহানবীর (দঃ) পর তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত আমানতদার। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আল্লাহ্র একত্ববাদ এবং হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর রিসালত প্রচারের সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত হন হযরত আলী (রাঃ)। মহানবী (দঃ) এর পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনের মধ্যে তাওহীদ গ্রহণের ব্যাপারে মহিলারা অগ্রবর্তী থাকে। কুরাইশ

এবং মক্কার বিভিন্ন ঘনিষ্ঠমহলে ইসলাম প্রচারের গোপন দায়িত্ব গ্রহণ করেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক দিকের সাংগঠনিক তৎপরতা নিয়মিতভাবে হুজুর (দঃ) নিজেই তদারক করতেন। মজলুম নির্যাতিত মানুষ মহানবীর (দঃ) প্রতি বিশেষ বিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা রাখতেন বিধায় হুজুর (দঃ) তাঁর পালক পুত্র যায়েদ বিন হারেস (রাঃ)-এর মাধ্যমে নির্যাতিত ক্রীতদাস এবং নিম্নবর্ণের মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। অর্থবিত্ত অস্ত্র, লোকবলে প্রবল প্রতিপত্তিশালীদের সার্বক্ষণিক প্রতিরোধের কারণে ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক কার্যকলাপ অতি গোপনে সম্পন্ন করতে হয়। মহানবী (দঃ) পবিত্র কাবাগৃহে নিয়মিত অবস্থান করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন এবং মূর্তিপূজাকে মানুষের মর্যাদার জন্য অপমানজনক, অবমাননাকর বলে ঘোষণা দিতেন। পবিত্র কাবাগৃহে জিয়ারতের সময় (হজ্জ) আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কাফেলার সঙ্গে পরিচয় এবং সম্পর্ক গড়ে তুলতে মহানবী (দঃ) সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন। ওকাযের বিখ্যাত মেলায় জজিরাতুল আরবের জনগণের বিশাল সমাগম ঘটত। মহানবী (দঃ) ওকাযের মেলায় গমন করে সংগোপনে জনগণকে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন। প্রভাবশালী সমাজপতি এবং বিত্তবানদের ধমক ও নানামুখি নির্যাতনের ভয়ে প্রকাশ্যে কেউ ঈমান না আনলেও মহানবীর (দঃ) বাণীতে অনেকে আস্তা পোষণ করতেন। তবে নির্যাতন এবং মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা করে যারা ঈমান আনেন তাঁরা এতো বুলন্দ আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন যে কোন প্রকার নির্যাতন এবং প্রলোভনে নিজেদের বিশ্বাস থেকে তাঁরা বিচ্যুত হননি। উল্লেখ্য যে, মহানবী (দঃ) প্রকাশ্যে নামায আদায় করতেন কিন্তু অন্যদের গোপনে তা সম্পন্ন করতে হতো। হযরত আবু বকরের (রাঃ) সান্নিধ্য এবং তৎপরতায় হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ, হযরত তালহাসহ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রাথমিকভাবে ইসলামের এ ধরণের অভিযাত্রা লক্ষ্য করে কুরাইশ নেতা আবু লাহাব এবং আবু সুফিয়ান অনুভব করল যে, মহানবীর (দঃ) আহ্বান এমন একটি প্রত্যয়ী ডাক যার কারণে তারা ক্রমশঃ দলিত-মথিত এবং সর্বস্বান্ত হতে যাচ্ছে। এ পর্যায়ে মহানবীর (দঃ) প্রতি নির্যাতন বিদ্রূপ এবং নৃশংসতার সীমা অতিক্রম করতে থাকে। মহানবীর (দঃ) উপর আবু জেহেলের অকথ্য নির্যাতন লক্ষ্য করে চাচা বীর কেশরী হযরত আমীর হামযা (রাঃ) প্রতিবাদী হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর পাক কুরআনের হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ করা সুমধুর বাণী শুনে আত্মহারা

হয়ে আবেগ আপ্ত অবস্থায় মহানবীর (দঃ) করকমলে নিজেকে সমর্পিত করেন অতিতেজ সাহসী সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠ, বিচক্ষণ মেধা, নৈর্ব্যক্তিক মেজাজ মননের অধিকারী হযরত ওমর (রাঃ)। হযরত ওমরের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম প্রচার প্রকাশ্য সাংগঠনিক রূপ নেয়।

হযরত ওমরের (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে তাওহীদপন্থীদের মধ্যে প্রবল উদ্যম এবং সাহসিকতা দেখা দেয়। ফলে অনেকে প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্মীয় বিধান পালনে উদ্যোগী হন। তাওহীদপন্থীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এবং দৃঢ়তা দেখে কেরাইশরা বিচলিত হয়ে নির্যাতনের নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগ করতে থাকে। আবু লাহাবের স্ত্রী মহানবীর (দঃ) যাতায়াত পথে বিষাক্ত কাঁটা পুতে রাখে। কোরাইশ এবং মক্কাবাসীদের চরম নোংরামির মধ্যেও মহানবী (দঃ) তাঁর তাওহীদ প্রচার কর্ম অব্যাহত রাখেন এবং মক্কায় হজ্জ পালন উদ্দেশ্যে আগত মদীনার লোকজনদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে তৎপর থাকেন। কাবা শরীফ জিয়ারতে আসা মদীনাবাসীদের কেউ কেউ আকাবা নামক স্থানে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুলের (দঃ) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ইসলাম ধর্ম কবুল করায় মহানবীর তাওহীদের মিশন গড়ে তোলার নতুন পথ উন্মোচিত হয়। এভাবে মদীনাবাসীদের একাত্মতায় আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় শপথের মধ্য দিয়ে মদীনা মিশনের অভিযাত্রা শুরু হয়। এদিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের উপর সীমাহীন নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে মক্কার মুসলমানদের কেউ কেউ আবিসিনিয়া এবং মদীনায় আশ্রয় নেন। শুরু হয় মদীনায় হযরতের কার্যক্রম। মহানবীকে (দঃ) হত্যার জন্য অবরোধ চলাকালে শেষ পর্যন্ত হযরত আবু বকর সিদ্দিককে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন হুজুর (দঃ)। হিজরতের উদ্দেশ্যে সওর পাহাড়ের নিকটে পৌঁছার পর উটকে থামিয়ে পিছনে ফিরে মহানবী (দঃ) উচ্চারণ করেন, “আল্লাহর সকল মৃত্তিকা থেকে আমার নিকট পবিত্রতম হচ্ছে হে মক্কা তোমার মৃত্তিকা। আল্লাহর নিকটও তুমি প্রিয়। আমার দেশবাসী যদি আমাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য না করত তা হলে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করতাম না।” এটি ছিল স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্তহীন বেদনাভরা অভিব্যক্তি। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে মক্কা এবং তায়েফে সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তিশালীদের প্রবল বাধা এবং সীমাহীন নির্যাতনের অভিজ্ঞতার আলোকে তাওহীদের প্রতিপক্ষকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলার জন্য মদীনায় হযরতের স্বল্পদিনের মধ্যে মদীনাবাসীদের নিয়ে গঠন করেন

‘মদীনা সাধারণতন্ত্র’। ঘোষণা করেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান-যা ইতিহাসে মদীনা সনদ নামে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। ‘মদীনা সনদ’ অনুযায়ী মদীনায় বসবাসরত মুসলিম, খৃস্টান, ইহুদী, পৌত্তলিকসহ সকল ধর্ম বিশ্বাসী মানুষের জীবন, সম্পদ, ইজ্জত, মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং স্ব স্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা সংরক্ষণের ঘোষণা প্রদান করা হয়। সামাজিক ন্যায় বিচার, সাম্য এবং মানবিক মর্যাদাকে মদীনা সাধারণতন্ত্রের মূলনীতি ঘোষণা করে মহানবী (দঃ) মদীনাবাসীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে তাওহীদ প্রচারে দৃঢ় পদক্ষেপে এগুতে থাকেন। ৫২টি ধারা সম্বলিত মদীনা সনদের আলোকে পরিচালিত মদীনা সাধারণতন্ত্রে কার্যকরভাবে ন্যায় বিচার, সমতা এবং খোদাভীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা পায়। মদীনা সাধারণতন্ত্রে জাতি, বর্ণ, গোত্র ও ভাষার ভিত্তিতে কোন প্রভেদ রেখা টানা হয়নি। মদীনা সনদ ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে মানব ঐক্য প্রতিষ্ঠার আক্ষরিক দলিল হওয়ায় বিশ্বের অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠ “লিংকনস ইন” এর স্মৃতি ফলকে বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম আইন দাতা হিসেবে সর্বশীর্ষে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর পবিত্র নামকে স্থান দেয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বৃটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং ইউরোপের রাজনৈতিক নবজাগৃতির অনন্য পথিকৃত জন লকের ‘সিভিল গভর্নমেন্ট’ এবং ফরাসি চিন্তাবিদ মন্টেস্কুর THE SPIT OF LAW গ্রন্থে মদীনা সনদ এবং মদীনা সাধারণতন্ত্রের গঠন প্রকৃতির ভাবাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। ওয়াশিংটনের জন হফকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY’ এর বিখ্যাত শিক্ষক এবং আধুনিক সমাজ চিন্তক প্রফেসর ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে (১) রাষ্ট্রের দল নিরপেক্ষ চরিত্র, (২) জবাবদিহিতা (জনগণের নিকট সরকারের সুস্পষ্ট জবাবদিহিতা), (৩) আইনের শাসন ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাকে প্রধান শর্ত হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীরা যে কোন বহিরাগত আক্রমণ সমবেতভাবে প্রতিহত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। ইউরোপ আমেরিকার সমাজ বিজ্ঞানীদের এসব প্রাথমিক চিন্তাধারা মদীনা সনদের আলোকে মদীনা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সহস্র সৎসর পূর্বে পৃথিবীর বুকে প্রতিফলিত হয়েছে।

মদীনা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর মদীনাবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক হৃদয়তা এবং নৈকট্য বৃদ্ধির পাশাপাশি বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবেলার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের অনুরণন সৃষ্টি করা হয়। সংবিধানের আলোকে মদীনা রাষ্ট্র

গড়ে ওঠায় সকল নাগরিক সংবিধানের প্রতি অনুগত এবং বিশ্বাসভাজন হিসেবে পরিগণিত হন। তবে সংবিধান লংঘন বা মদীনা রাষ্ট্রের ঐক্য বিঘ্নিত হবার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা আইন অনুযায়ী শাস্তির মুখোমুখি হবার শর্ত ঘোষণা করে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়। মদীনা সাধারণতন্ত্রে স্বাক্ষরদানকারী সকল ধর্মীয়, গোত্রীয় এবং গোষ্ঠী প্রতিনিধিদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহানবী (দঃ) রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। মহানবী (দঃ) মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলেন মদীনা সাধারণতন্ত্রের সচিবালয়। এখান থেকে মদীনার অভ্যন্তরীণ শাসন, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা যেমন পরিচালিত হত, তেমনি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রাজা বাদশাহ সম্রাটদের সঙ্গে পত্র-যোগাযোগ করা হত। মক্কা জীবনের তের বছর নবুয়তের কার্যক্রম চলেছে অত্যন্ত গোপনে, সর্বাবস্থায় প্রতিকূল পরিবেশে। মদীনা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রীয় ঐক্য সংহতি এবং শক্তির সমন্বয়ে তাওহীদ প্রচার প্রকাশ্যে বজ্র নিনাদে শুরু হয়। মদীনা রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক অভিযাত্রা কোরাইশ এবং মক্কাবাসীদেরকে শংকিত করে তোলে। কোরাইশরা মদীনা আক্রমণের মাধ্যমে তাওহীদ দুর্গ চূর্ণ বিচূর্ণ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। মহানবী (দঃ) কোরাইশদের উদ্যোগ প্রতিহত করার পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাহের প্রতিও পত্র মারফত তাওহীদের দাওয়াত এবং ইসলাম ধর্মের শান্তির বাণী পৌঁছানোর কাজ শুরু করেন।

মদীনা প্রজাতন্ত্রের মাধ্যমে তাওহীদপন্থীদের রাষ্ট্রশক্তি অর্জন এবং নির্বিঘ্নে ইসলাম ধর্মপ্রচারে স্বতস্কূর্ততা লক্ষ্য করে কোরাইশরা বেপরোয়াভাবে ৬ষ্ঠ খৃস্টাব্দের রমজান মাসে মদীনা আক্রমণের জন্য মদীনার অদূরে বদর প্রান্তরে সশস্ত্র অবস্থায় সমবেত হয়। পৃথিবীখ্যাত এ যুদ্ধে মুসলমানরা মাত্র ৩১৩ জন সৈন্য নিয়ে তিন গুণের অধিক কোরাইশ বাহিনীর সশস্ত্র শক্তিকে প্রতিহত করে। এ যুদ্ধে মহান আল্লাহর অসীম কুদরতে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে মুসলমানদের বিজয় অর্জনের ফলে শুধু মক্কাবাসী নয় বরং প্রতিবেশীর রাজা বাদশাহকেও হতচকিত করে তোলে। বস্তুত ইসলাম ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে জালেমদের নানামুখি প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধে বদর যুদ্ধের মাধ্যমে জিহাদের সূত্রপাত ঘটে। জিহাদ প্রসঙ্গে সূরা বাকারার ১৯০ আয়াতে উল্লেখ আছে, “(হে বিশ্বাসীগণ) কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। কিন্তু কখনো সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীকে অপছন্দ করেন।”

বদর যুদ্ধের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে প্রফেসর নিকলসন উল্লেখ করেন, “বদরের বিজয়ে সকলের দৃষ্টি মুহাম্মদ (দঃ) এর উপর নিবদ্ধ হল। আরবগণ তাঁর ধর্মকে যতই উপেক্ষা করুক না কেন, তাঁকে সম্মান না করে পারেনি।” বদর যুদ্ধের পর মহানবীর (দঃ) সম্মান এবং মর্যাদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে মহানবী (দঃ) একদিকে মদীনা প্রজাতন্ত্রের ‘প্রেসিডেন্ট’ এবং অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ‘নবী’ হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পত্র মারফত দূত প্রেরণ করে স্বীয় ধর্মের তাওহীদবাদী নির্দেশনা এবং রাষ্ট্রীয় অবস্থান রাজা বাদশাহকে স্পষ্টভাবে অবহিত করে এক আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আহ্বান জানান। বিভিন্ন দেশে দূত মারফত পত্র প্রেরণের মধ্য দিয়ে একদিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারের অভিব্যক্তি যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি রাজা বাদশাহদের নিকট ‘মদীনা রাষ্ট্র’ ব্যবস্থার স্বীকৃতিও অর্জিত হয়েছে। মহানবী (দঃ) এর নবুয়ত এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের নির্দেশনা হিসেবে আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী, মক্কার কোরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান, রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ ও হরমুজ, মিশরের রাজকীয় প্রতিনিধি মুকাউকিস, ইয়ামামার গভর্নর হাউজা বিন আলী, দামেস্কের হারিস গাস্‌সানী, বাহারাইনের মুন্জির বিন সাওয়া, ওমানের আবদ ও জায়কার, হিমাইয়ার রাজন্যবর্গ, মাআনের গভর্নর, ইয়েমেনের গভর্নর, দুমাতুল জান্দাল এর শাসক, রোমের পোপ, খায়বর বাসী ইহুদী, আসলাম গোত্রসহ বিভিন্ন এলাকার গোষ্ঠী প্রধান এবং গোত্রীয় নেতাদের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। এই সকল পত্রের মর্মবাণী ছিল (১) একমাত্র স্রষ্টা মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ, (২) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, (৩) অন্যায় অত্যাচার জুলুম বন্ধ করা, (৪) কিতাবধারীদের প্রতি তাওহীদে আদিয়ান এর আলোকে সমবেত হবার আহ্বান। পত্র প্রেরণের মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণের জন্য সুনির্মল আহ্বান সর্বত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। কেউ কেউ পত্রের মর্মার্থকে নেতিবাচক অর্থে গ্রহণ করলেও অনেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্যে পত্রের মর্মবাণীকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেন। অনেকে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে মহানবীর (দঃ) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তাওহীদ প্রচারে মহানবীর (দঃ) বহিঃমুখি তৎপরতা এবং সাফল্যে মক্কাবাসীদের মধ্যে ক্রোধ বাড়তে থাকে। বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে কোরাইশরা ৬২৫ খৃস্টাব্দের ২৩ মার্চ ৩৫০০ সৈন্য নিয়ে ওহুদ প্রান্তরে সমবেত হয়। ওহুদ প্রান্তরে প্রথম দিকে মুসলমানরা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। কিন্তু গনিমতের

লোভে মুসলিম বাহিনীর একটি বড় অংশ মহানবীর (দঃ) নির্দেশনা উপেক্ষা করে শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পদ করায়ত্তে ঝাঁপিয়ে পড়লে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যুহ ভেঙ্গে পড়ে। এ যুদ্ধে মুসলমানদের চরম বিপর্যয় ঘটে। বীর কেশরী আমীর হামযা (রাঃ) এই যুদ্ধে শহীদ হন। আল্লাহর বিশেষ রহমতে হযরত তালহার (রাঃ) জীবন ঝুঁকির মুখে মহানবীর (দঃ) জীবন রক্ষা পায়। এ যুদ্ধে মহানবীর (দঃ) দত্ত মোবারক শহীদ হয়। ওহুদের যুদ্ধে বিপর্যয় নিশ্চিত হবার পরও মহানবী (দঃ) ঘোষণা দেন, “আমার আদেশ অগ্রাহ্য করায় তোমরা বিপদগ্রস্ত হয়েছ। এক্ষণে তোমরা সাহসের সহিত আত্ম রক্ষার্থে প্রবৃত্ত হও।” মহানবীর (দঃ) এই আদেশ কার্যকর হবার ফলে কোরাইশরা মদীনা আক্রমণের জন্য উদ্যোগ নিতে পারেনি। ওহুদের যুদ্ধ ছিল তাওহীদবাদীদের সংশোধনের জন্য একটি শিক্ষা। কোরাইশরা তাওহীদের মূলকেন্দ্র ‘মদীনা সাধারণতন্ত্র’ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৬২৭ খৃস্টাব্দে পুনরায় মদীনা আক্রমণে অগ্রসর হয়। এ সময় মদীনায় বসবাসরত ইহুদীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে। একই সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল বেদুইনরা কোরাইশদের সমর্থনে সৈন্য প্রেরণ করে। এ ধরনের নাজুক পরিস্থিতিতে হযরত সালমান ফারসীর (রাঃ) পরামর্শে মদীনার তিনদিকে গভীর পরিখা বা খন্দক খনন করে নতুন ধারার প্রতিরোধ ব্যুহ গড়ার মাধ্যমে কোরাইশদের হতোদ্যম করে বিতাড়িত করা হয়। মহানবী (দঃ) এবং মুসলমানদের প্রতি ইহুদীদের বৈরীতার বহিঃপ্রকাশ ঘটলে মদীনা সাধারণতন্ত্রের ঐক্য, সংহতি এবং স্বাধীনতা বিঘ্ন হবার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কারণে মদীনা সনদের বিধান অনুযায়ী মহানবী (দঃ) ইহুদী গোত্রীয় নেতা সাদ বিন মা’জের বিচারিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদের প্রাণদণ্ড এবং অন্যান্য শাস্তি প্রদান করা হয়। মদীনা সনদের বিধান অনুযায়ী বিশ্বাসঘাতকরা রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। ইসলাম প্রচারের সময়ে ৬২৮ খৃস্টাব্দে মুসলমানদের সঙ্গে সম্পাদিত হুদায়বিয়ার সন্ধি মূলতঃ কোরাইশ কর্তৃক পরোক্ষভাবে মহানবী (দঃ) এবং প্রত্যক্ষভাবে মদীনা সাধারণতন্ত্রের শক্তিশালী অবস্থানকে স্বীকার করে নেয়া হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধিকে পবিত্র কোরআনে ‘ফাতহুম মুবিন’ বা সুস্পষ্ট ‘মহা বিজয়’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর মহানবী (দঃ) প্রতিবেশী দেশগুলোতে পত্রসহ দূত প্রেরণের মাধ্যমে সর্বত্র কর্মচঞ্চলতা বাড়িয়ে দেন। চতুর্দিকে তাওহীদের দাওয়াত এবং ইসলাম ধর্মের শান্তির পয়গাম ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইতোমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা এবং রাষ্ট্রীয় সংবিধান ভঙ্গ করায় মদীনা সাধারণতন্ত্র থেকে

ইহুদীরা খাইবার নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে। খাইবার সীমান্তবর্তী একটি অঞ্চল। খাইবার এলাকায় বসতি স্থাপনের পর ইহুদীরা ইসলাম ধর্মের ব্যাপক উত্থান প্রতিরোধকল্পে ৬২৮ খৃস্টাব্দে বেদুঈনদের সহযোগিতায় মদীনা সাধারণতন্ত্র আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। এ লক্ষ্যে খাইবারের ইহুদীরা চার হাজার সদস্যের এক সেনাবাহিনী গঠন করে। খাইবারের ইহুদীদের সমর প্রস্তুতির পরিপ্রেক্ষিতে সুদক্ষ সেনাবাহিনী গঠন করে তাওহীদপন্থীরা খাইবার অবরোধ করে। দীর্ঘ সময় অবরোধ অব্যাহত রাখা সত্ত্বেও খাইবার বিজয় দুরূহ হয়ে পড়ায় শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের পতাকা মহানবীর, ঐশী প্রণোদনার অধিকারী হযরত আলীর (রাঃ) হস্তে সমর্পণ করা হয়। হযরত আলীর মহিমাময় বীরত্ব এবং ঐশী শক্তির সম্মুখে খাইবারের অজেয় দুর্গ ‘খামুস’ এর পতন ঘটে। এ যুদ্ধে মহা বিজয় অর্জন করার পর হযরত আলী (রাঃ) ‘আলী হায়দার’ অভিধায় মহা সম্মানে সম্বোধিত হন। মহানবী (দঃ) তাঁকে ‘আসাদুল্লাহ’ খেতাব দেন এবং বিখ্যাত তরবারি ‘জুলফিকার’ হযরত আলীর (রাঃ) হস্তে সমর্পণ করেন। ৬২৯ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে মহানবী (দঃ) দুই হাজার অনুগামীসহ মূলতবী হজ্জ সম্পন্ন করেন। ৬২৯ খৃস্টাব্দে মহানবী (দঃ) এর রাষ্ট্রীয় দূত হযরত হারিস বিন উমাইয়া সিরিয়ার সামন্ত রাজা সোহরাবিল বিন আমর কর্তৃক নিহত হন। এ ধরণের অনৈতিক এবং শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিরোধী ঘটনায় মহানবী (দঃ) খুবই ব্যথিত হন। এ কারণে সিরিয়ার সামন্তরাজাকে শাস্তি প্রদান জরুরী হয়ে পড়ায় তিন হাজার সৈন্যসহ ‘মুতা’ অভিযান পরিচালনা করা হয়। ‘মুতা’ অভিযান প্রতিরোধে সিরিয়ার সামন্ত রাজা আরব উপজাতি এবং বাইজেন্টাইনদের সহযোগিতায় একলক্ষ সৈন্যের সমাবেশ ঘটায়। মুসলিম বাহিনীর তিন হাজার সদস্যের সেনাপতিত্ব মহানবী (দঃ) স্বয়ং গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁর পালক পুত্র জায়েদ বিন হারিসকে সেনাপতি করা হয়। বিশাল বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণের মুখে সেনাপতি জায়েদ বিন হারিস (রাঃ), হযরত জাফর তাইয়ার (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) পরপর সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। মুসলিম বাহিনীর সার্বিক বিপর্যয় ঠেকাতে সেনাপতির দায়িত্ব নেন খালিদ বিন ওলীদ (রাঃ)। প্রচণ্ড সাহসিকতা এবং অভিনব রণকৌশল গ্রহণ করে খালিদ এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর ব্যাপক বিপর্যয় ঠেকাতে সক্ষম হন। তাঁর অসাধারণ বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ মহানবী (দঃ) তাঁকে ‘সায়ফুল্লাহ’ বা আল্লাহর তরবারি উপাধি দেন।

৬৩০ খৃস্টাব্দে মহানবীর (দঃ) নেতৃত্বে ইসলামের বিজয় পতাকা আল্লাহর পবিত্র গৃহ ‘কাবার’ শীর্ষে উত্তোলিত হয়। হৃদয়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী মুসলমানরা ওমরা হজ্জ পালনের নিশ্চয়তা পায় এবং কুরাইশ যুবকদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত

হবার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। হৃদয়বিয়ার সন্ধির পর বানু খোজার প্রতি [মহানবীর (দঃ) মিত্র পক্ষ] কোরাইশদের অনুগত বানু বকরের নিষ্ঠুরতা এবং অত্যাচারের মধ্য দিয়ে কোরাইশরা সন্ধির শর্ত লংঘন করে। বানু খোজার সঙ্গে মহানবী (দঃ) মক্কা অভিযানের বিষয়টি অত্যন্ত গোপনে একান্তভাবে শুধুমাত্র হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং হযরত ওমর ফারুককে (রাঃ) অবহিত করেন। মক্কা অভিযানের যাবতীয় প্রস্তুতি তাঁর তিনজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সকলকে গোপনে সংঘবদ্ধ করেন। সার্বিক রণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে মহানবী (দঃ) ৬৩০ খৃস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি (১০ রমজান, অষ্টম হিজরী) মক্কা নগরীর দ্বার প্রান্তে উপনীত হন। মহানবীর (দঃ) নেতৃত্বাধীন বিশাল সেনাবাহিনীর সশস্ত্র সুশৃঙ্খল অবস্থা এবং মদীনা সাধারণতন্ত্রের গোত্রীয় পতাকাসহ ইসলামের পতাকা উড্ডীন করে এগিয়ে আসার অবস্থান দেখে মুসলিম শক্তি পর্যবেক্ষণে আসা মহানবীর (দঃ) চাচা হযরত আব্বাস ইসলাম গ্রহণ করেন। ঈমানের শক্তি এবং প্রাবল্যে বুলন্দ মুসলিমরা বীরদর্পে এগিয়ে আসার সংবাদ অবহিত হয়ে কোরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান মহানবীকে (দঃ) অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি নেন। হতবিহ্বল মক্কাবাসীকে মহানবী (দঃ) সার্বিক নিরাপত্তা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে স্ব স্ব গৃহে অবস্থান করার নির্দেশ দেন। হযরত আব্বাসের (রাঃ) প্রস্তাবক্রমে মহানবী (দঃ) আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় গ্রহণকারীদের নিরাপত্তারও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য যে আবু সুফিয়ান মক্কার অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় মহানবী (দঃ) মক্কার দ্বার প্রান্তে দ্বিতীয় দিন অবস্থানকালে আনসার এবং মুহাজিরদের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে দরবার বসান। সেখানে আবু সুফিয়ানকে আনা হয়। মহানবী (দঃ) আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে আবু সুফিয়ান, এখনও কি তোমার ঘোষণা দেবার সময় হয়নি যে আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়? আবু সুফিয়ান উত্তর করেন, “হে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ, আল্লাহর কাছে শপথ করছি যে যদি আল্লাহর কোন সঙ্গী থাকত তাহলে যথেষ্ট সময় ছিল তা প্রমাণ দেবার। কিন্তু আল্লাহ সে প্রমাণ দেননি।” রাসূল (দঃ) তখন বললেন, “এখনও কি তোমার একথা স্বীকার করার সময় আসেনি যে আমি আল্লাহর রাসূল?” আবু সুফিয়ান উত্তর করেন, “আল্লাহ যে এক এবং অদ্বিতীয় সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় নেই, কিন্তু আপনার দাবী নিয়ে আমার এখনও কিছুটা সংশয় আছে।” হযরত আব্বাস (রাঃ) তখন আবু সুফিয়ানকে বলেন, “তুমি যদি ইসলাম কবুল না কর তাহলে তোমার অতীত কার্যাবলীর পরীক্ষা স্বরূপ শিরশ্ছেদ করা হবে।” হযরত আব্বাসের (রাঃ) অভিব্যক্তি শুনে আবু সুফিয়ান মহানবীর (দঃ) কর কমলে নিজেকে সমর্পণ করে ইসলাম কবুল করেন। আবু সুফিয়ানের আত্মসমর্পণের মধ্য

দিয়ে অতি দ্রুত রক্তপাতহীনভাবে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়। এখানে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, এক আল্লাহর প্রতি ঈমানের প্রধান শর্ত হচ্ছে রাসূল (দঃ) এর প্রতি পূর্ণ ঈমান আনয়ন। আবু সুফিয়ানের আত্মসমর্পণের পর ইকরামার নেতৃত্বে কিছুসংখ্যক কুরাইশ মক্কার দক্ষিণ ফটকে বাধার সৃষ্টি করলে, খালিদ বিন ওলিদ তা প্রতিহত করে মক্কায় প্রবেশ করেন। এতে ২৪জন কুরাইশ নিহত এবং বানু খোজা গোত্রের দুইজন প্রাণ হারান।

রক্তপাতহীনভাবে মক্কা বিজয়ের সময় পবিত্র নগরী মক্কায় প্রবেশকালে মহানবী (দঃ) তাঁর মস্তক নিচু করে রাখেন। তিনি মহান আল্লাহর প্রতি দীনতা প্রকাশ করে অত্যন্ত বিনয়ে মস্তক আনত করে মক্কায় প্রবেশ করেন। পৃথিবীতে সকল বিজয়ী নেতা গর্বিত অবস্থায় উচ্চশিরে ভয়ংকর পরিবেশ সৃষ্টি করে দখলকৃত এলাকায় প্রবেশ করে। মহানবী (দঃ) বিজয়ী বেশে ব্যতিক্রমী পন্থায় আল্লাহর নিকট অসীম কৃতজ্ঞচিত্তে পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করেন। মক্কার সকলকে পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ অথবা পূর্ববর্তী ধর্ম পালনের বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। মহানবীর (দঃ) অনুপম ঘোষণায় সকল মক্কাবাসী উৎফুল্লচিত্তে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মক্কা নগরীর পবিত্রতম গৃহ কাবা শরীফে প্রবেশকালে মহানবীর (দঃ) হস্তস্থিত দন্ডের স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে সকল মূর্তি উপুড় হয়ে পড়ে যায়। এ সময় মহানবীর (দঃ) কণ্ঠে সুললিত সুরে পবিত্র কুরআনের আয়াত, “ওয়াকুল যাআল হাক্কা ওয়াহাকাল বাতিলা ইন্না ল বাতিলা কানা জাহ্কা।” “এবং বল সত্য পরিদৃশ্যমান হয়েছে এবং মিথ্যা প্রাণশক্তিহীন হয়েছে, কেন না জানবে মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য।” সেদিন থেকে কাবাগৃহে মূর্তি পূজা এবং সংরক্ষণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং চিরতরের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়। কাবা শরীফ তাওহীদের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে স্থিত হয়ে যায়। মহানবী (দঃ) ইসলাম প্রচারকালে যেমন জিহাদ পরিচালনা করেছেন, তেমনি আহলে সুফ্যাসহ তাওহীদ প্রচারকদের বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করে নির্বিবাদে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রাসূল হিসেবে মহানবী (দঃ) এর উপর রিসালত ঘোষণার পর ঈমান আনতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়ে জিহাদের মাধ্যমে প্রচারণা অব্যাহত রাখেন।

জিহাদ সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণায় (১) আক্রমণকারী হতে নিষেধ করা হয়েছে। (২) সীমা লংঘনে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে (৩) সম্পদ অর্জন অথবা সাম্রাজ্য বিস্তার নয়, জিহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বিশ্বের সর্বত্র একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করা। (৪) যতবেশি সম্ভব রক্তপাত এড়িয়ে বিজয় অর্জনে সচেষ্ট থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ওহদের যুদ্ধে হযরত হামযার (রাঃ) দেহ বিকৃত করায় মহানবী (দঃ) ক্রুদ্ধ স্বরে দেহবিকৃতির মাধ্যমে প্রতিশোধের অভিব্যক্তি করেন। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নাযেল হয়, “যদি শত্রুর আঘাতকে প্রতিঘাত করতে হয় তবে শত্রু তোমাকে যতটা আঘাত করেছে, তুমিও ততটাই আঘাত করবে। কিন্তু তুমি যদি ধৈর্য ধারণ কর তাহলে সেটাই তোমার জন্য ভাল কেননা আল্লাহ যারা ধৈর্য ধারণ করে তাদের সাথে থাকেন” (সূরা আন নহল, ১২৬ আয়াত)। এ ওহী নযেলের পর রাসূল (দঃ) প্রতিশোধের ইচ্ছা প্রত্যাহার করে নির্দেশ দেন, “তারা (মুসলমান) যেন কোন মৃত দেহের অসম্মান না করে।” এছাড়া যুদ্ধের সময় কোন মানুষের চেহারায় আঘাত করতে নিষেধ করে মহানবী (দঃ) ঘোষণা দেন, “আল্লাহ আদমকে তাঁর নিজের আকৃতিতে নির্মাণ করেছেন। তাই মানুষের মুখাবয়বে কখনো আঘাত করবে না।” উপর্যুক্ত হাদিস শরিফের আলোকে মাইজভাগুর শরিফে গীত হয়, “আপনি নিরাকার বলো, কার রূপেতে আদম হল।” মহান আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা এবং কৌশলে পরম ধৈর্যের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং তাওহীদের সাওগাত পৌঁছানোর কারণে মহানবীর (দঃ) পৃথিবীতে অবস্থানকালে ২৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা মহানবীর (দঃ) প্রভাবাধীন হয়। ইসলামের এ ধরণের অভিযান এবং অগ্রযাত্রায় শত্রুপক্ষের মাত্র ১৫০জন নিহত এবং মুসলমানদের মাত্র ১২০জন শহীদ হন। পৃথিবীর ইতিহাসে তাওহীদের শাস্বত বাণী প্রচারে এ ধরণের অনন্য বিপ্লবের কোন বিকল্প নজির নেই। (চলবে)

সূফী উদ্ধৃতি

- আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাকে তিনটি স্বভাব দান করেন। যথা- (ক) সমুদ্রের মত বদান্যতা, (খ) সূর্যের ন্যায় উদারতা ও (গ) ভূতলের ন্যায় নম্রতা।”
- আল্লাহ যাকে যোগ্য ও উপযুক্ত করেন, তার পিছনে এক ফিরআউন লাগিয়ে দেন।”
- সৎ সাহচর্য সৎকার্য থেকে উত্তম আর কুসংসর্গ কুকার্য থেকে মন্দ।”

—হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)

শ্রেষ্ঠ নবী'র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শ্রেষ্ঠ মু'জিয়া

• ইউসুফ মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন শাহ •

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মহান আল্লাহ তা'আলা তদীয় হাবিব বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী সৃষ্টিকুলের সেরা রাসূল, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অসংখ্য অলৌকিক ক্ষমতা তথা মো'জিয়া দান পূর্বক এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। যা এ স্বল্প পরিসরে লিখে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ তা'আলা '১০৪' খানা আসমানী গ্রন্থে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র অলৌকিক ক্ষমতা, মর্যাদা, জীবন দর্শন ইত্যাদি অবতীর্ণ করেছেন। হযরত আদম (আলাইহিসসালাম) থেকে হযরত ঈসা (আলাইহিসসালাম) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল (আলাইহিসসালাম) ঐ মহান নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রাপ্ত মু'জিয়া, মর্যাদা আপন উম্মতের নিকট বর্ণনা করেছেন। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র তিরোধানের পর অদ্যাবধি যুগ থেকে যুগান্তরে কাল থেকে কালান্তরে অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী, কলামিস্ট, সাহিত্যিক, সূফি-দরবেশ, দার্শনিকগণ অসংখ্য গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন, অনেক উপদেশাবলিও পেশ করেছেন। কেউ আজও তার ইতি টানতে পারেনি, আর তাহা যেন অসম্ভবই রয়ে গেল।

*মু'জিয়া এর সংজ্ঞা: মু'জিয়া শব্দটি ব্যপক অর্থবোধক শব্দ বিশ্বের অনেক মনীষি বিভিন্নভাবে মু'জিয়া এর পরিচয় দান করেছেন, যেমন “প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র এমন সব ভাবধারা, পর্যবেক্ষণ, অস্বাভাবিক কাজকর্ম, অভ্যাস ও আদত যাহা দ্বারা তিনি বিশ্ববাসীকে কল্যাণ ও সৌভাগ্যের দিকে আহ্বান করেন, আর এ আহ্বানের সম্পৃক্ততা মূলত নবুয়তের সাথে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পরম একটি ঘোষণাকে বাস্তব হিসেবে প্রকাশ করা, আর উক্ত ঘোষণা হলো, ‘নিশ্চয় তিনি আল্লাহর রাসূল’। (আত্তারিফাত, পৃ-২১৭, নং-১৭৪৮, কৃত- আল্লামা সৈয়্যদ শরীফ আবিল হাসান আলি বিন মুহাম্মদ বিন আলি আল হুসাইনি আলজুরজানী আল হানাফী রহ. ওফাত, ৮১২ হিজরী।)

২। ইমাম ক্বাযিউল কুয্বাত আবুল হাসান আলি বিন মুহাম্মদ আল মাওয়ারদী রহ.স্বীয় গ্রন্থ ‘আ'লামুন নাবুয়াত’ গ্রন্থে মু'জিয়া'র উপর নিম্নোক্ত বিশেষ প্রামাণ্য সংজ্ঞা পেশ করেছেন যেমন- “মু'জিয়া হলো এমন অস্বাভাবিক বিষয় যা কেবল সত্যতার উপর বুঝাবে। সুতরাং মু'জিয়া একজন মানুষের এমন কতক ভাবধারা, অভ্যাস, বিশেষ অলৌকিক কিছু ও আদতকে বুঝায় যা মহান আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতিরেকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এবং মহান আল্লাহ তায়ালা উক্ত বিষয়াবলীকে এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেছেন এর দ্বারা রিসালাতের

বৈশিষ্ট্যাবলীকে সত্যায়িত করা হয়। ফলে উক্ত সত্যতা দ্বারা নবুয়তের প্রতি বিশ্বমানব গোষ্ঠীকে আহ্বান করার এমন এক সু-স্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় যখন তিনি (যাদুকর ও কাফির-মুশরিকদের দেওয়া) বিভিন্ন প্রকার কষ্টসাধ্য কালের মোকাবিলায় ঐসব মু'জিয়াসমূহ প্রদর্শন করে মিথ্যা-বাতুলতা প্রমাণ করে সত্য ও বাস্তব বিষয়াবলীকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ইত্যাদি।” (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন ফি মু'জিয়া-তি সায্যিদিল মুরসালিন, পৃ-১৩, কৃত আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাঈল আনু নিবহানী রহ.)

আহলে সুনাত ওয়াল জামাআতের মতে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র মু'জিয়াসমূহে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী বিদ্যমান থাকবে। ১। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ প্রদত্ত অদৃশ্য জ্ঞান (ইলমে গায়ব) বিষয়ে অবহিত হবেন। ২। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফিরিশ্তাগণকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবলোকন করবেন। ৩। এবং তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়ম-ভঙ্গকারী তথা মানব জ্ঞানের প্রতিকূলে সংঘটিত অস্বাভাবিক, উম্মতের জন্য সার্বিক সাহায্য, বিশেষ দয়া, অতীব আশ্চর্য ও অলৌকিক বিষয়াবলী তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওফাত পূর্ব-পরবর্তী সময়ে সমান বিদ্যমান থাকবে। ৪। ইহকাল ও আলমে বরযকু তথা পরকালিন বিষয়াবলীর বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করা ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিষয়ালোকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র যাহেরী জীবনে সংঘটিত হাজারো মু'জিয়া থেকে অতীব অল্পসংখ্যক নির্বাচিত মু'জিয়া সমূহ নিম্নে পেশ করা হলো।

মু'জিয়া [১]:-শ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)'র ইসলাম গ্রহণ:

ইবনে আসাকির ‘তারিখে দামেশকু’ গ্রন্থে হযরত কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সংকলিত হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ইসলাম গ্রহণ মূলত ‘ওহির’ দ্বারা প্রাপ্ত আদেশ ছিল। অপরদিকে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র অদৃশ্য জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ছিল। আর তা হল এই, একদা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করলেন, তথায় তিনি একটি বিরল স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নের সার-সংক্ষেপ হলো ‘আকাশের সূর্য-চন্দ্র অবতীর্ণ হয়ে তার কোলে ঢলে পড়ল, আর তিনি তা আপন চাদরের ভেতর ঢেকে নিচ্ছেন’। উক্ত স্বপ্নের ‘তা'বির’ (ব্যাখ্যা) জানার উদ্দেশ্যে তিনি তথাকার গীর্জার এক খ্রীস্টীয় পাদ্রী ‘বুহায়রা’ এর শরণাপন্ন হলেন। এবং তার নিকট

স্বপ্নের বিষয়টুকু পেশ করে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। 'বুহায়রা' ছিলেন আসমানি গ্রন্থ তাওরীত-ইন্জিলের হাফেজ। তাই তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাছিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)'র স্বপ্নের বিবরণটুকু অত্যন্ত গভীরভাবে শ্রবণ করলেন। যেহেতু আবুবকর সিদ্দিক (রাছিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)'র উক্ত স্বপ্নের বিবরণ পূর্বে অবতীর্ণ আসমানি গ্রন্থে ছিলো। তাই 'বুহায়রা' অতিব বিচক্ষণতার সাথে জানতে চাইলেন; "তুমি কোথাকার অধিবাসি?" তিনি উত্তর দিলেন: আমাদের আবাসস্থল 'মক্কা'। 'বুহায়রা' পুনঃ প্রশ্ন করলেন: "তুমি কোন গোত্রের অধিবাসি?" তিনি বললেন: "কুরাইশ গোত্রিয়"। বুহায়রা পুনঃ প্রশ্ন করলেন, "আপনি কোন বস্তুর অবলম্বনে জিবিকা উপার্জন করেন?" উত্তরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাছিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: 'ব্যবসা', 'বুহায়রা' স্বীয় কৃত প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তর পেয়ে উক্ত স্বপ্নের ব্যখ্যা এভাবে করলেন "মহান আল্লাহ তা'আলা তোমার এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করবেন, আর তা হল 'মহান আল্লাহ তা'আলা তোমার স্বীয় গোত্র হতে একজন মহান নবী প্রেরণ করবেন, আর তুমি ঐ মহান নবীর একান্ত সঙ্গি (সাহাবী) হবে, সু-পরামর্শদাতা হবে এবং তার তীরোধানের পর তুমিই একমাত্র তাঁর প্রধান খলিফা নির্বাচিত হবে"। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাছিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এমন উত্তর পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন, হৃদয়ে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হলো, হঠাৎ তিনি কি যেন হতে যাচ্ছেন! যেহেতু তিনি পূর্ব থেকে আরবের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয়, প্রসিদ্ধ সততার উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত ও অতীব বিচক্ষণশীল ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। এমনকি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র একান্ত বাল্য বন্ধু ছিলেন, বয়সে নবীজির ছয় মাসের ছোট ছিলেন। তাই তিনি স্বপ্নের কথা গোপন রাখলেন। ইত্যবসরে মক্কায় ঐ মহান নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র নবুয়ত প্রকাশিত হলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাছিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবীজির শরণাপন্ন হলেন এবং নবুয়তের নিদর্শনাবলি অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন, অতঃপর নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে দেখা মাত্র 'ইসলাম'র দাওয়াত পেশ করলে তিনি অত্যন্ত আদবের সাথে এ বলে প্রশ্ন করলেন: "আপনার নবুয়তের কোন প্রমাণ রয়েছে কী?" উত্তরে অদৃশ্যজ্ঞানের অধিকারী, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী, রাহমাতুল্লিল আ-লামীন প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ হে আবু বকর আমার নবুয়তের প্রমাণ হলো "তোমার ঐ স্বপ্ন যা তুমি সিরিয়ায় দেখেছিলে"। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাছিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এমন উত্তর শুনে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন, খুশিতে আত্মহারা হয়ে নব জীবনের অধ্যায় সূচনা করার লক্ষ্যে মহান নবীর সান্নিধ্য গ্রহণ করলেন এবং মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আপন বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন এবং নবীজির

নবুয়তের নুরানী ললাটে চুম্বন দিলেন। অতঃপর অত্যন্ত আবেগাপ্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে সুউচ্চ শব্দে ধ্বণিত করলেন, "আমি সাক্ষি দিচ্ছি নিশ্চয় আপনি আল্লাহর মহান রাসূল"। আরবের এই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের রসনায় নবুয়তের জয়গান শুনে আরব গোত্র সমাজে এক গভীর প্রভাব ফেলল। মুখরিত হলো আকাশ-বাতাস। আত্ম তৃপ্তিবোধ করলেন নবুয়তের মহান সূর্য মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (সোবহানাল্লাহু)

ইবনে আসাকির হযরত আব্দুর রহমান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন; হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাছিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল "আপনি ইসলাম ধর্ম প্রকাশের পূর্বে জাহেলি যুগে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র নবুয়তের কোন নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছেন কি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ 'হ্যাঁ' এবং তিনি আরও কিছু বৃদ্ধি করে বললেন কোরায়শ বংশীয় বা অন্য কোন গোত্রিয় এমন কেউ অবশিষ্ট ছিলনা, যে ব্যক্তি নবীজির কোন একটি মু'জিয়া সম্পর্কে অবগত ছিলনা। একদা আমি জাহেলি যুগে একটি বৃক্ষের নিচে উপবিষ্ট ছিলাম হঠাৎ একটি বৃক্ষের ডাল আমার মাথার খুব নিকটবর্তী ঝুঁকে পড়ল এতে আমি যেন অতীব হতভম্ব হয়ে পড়লাম, এ যেন আমার জন্য অতীব আশ্চর্যের বিষয়। হঠাৎ ঐ বৃক্ষকাণ্ড থেকে শব্দ ধ্বণিত হলো: "(হে লোক সকল শোন!) তোমাদের মধ্যে এমন এক মহান নবীর শুভাগমন হয়েছে এবং তার নবুয়ত প্রকাশিত হয়েছে তোমাদের সকলেরই তার সান্নিধ্যে নিজেদেরকে উৎসর্গ করা আবশ্যিক।"

"উল্লেখ্য যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উপর সর্বপ্রথম 'ওহি' অবতীর্ণ হয়েছিল সোমবার দিবসে, আর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাছিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উক্ত সোমবারেই স্বপ্নটুকু দেখেছিলেন। সুতরাং, তিনি মঙ্গলবার দিবস সিরিয়া থেকে রওয়ানা হলেন এবং বুধবার ভোর সকালেই তিনি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র হাতে ঈমানের প্রেমসুধা পান করলেন। সোবহানাল্লাহু! হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাছিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়ে একাধিক বর্ণনা রয়েছে, ইবনে ইসহাক এর প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে "সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করেন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রথম সহধর্মিনী হযরত খাদিজাতুল কোবরা বিনতে খোয়াইলিদ (রাছিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা), অতঃপর প্রথম পর্যায়ে ঈমান গ্রহণ করেন হযরত আলি বিন আবি তালিব (রাছিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তখন তিনি দশ বৎসরের কিশোর ছিলেন। তারপর ঈমান আনয়ন করেন (নবীজির পালকপুত্র) হযরত যায়েদ বিন হারেসাহ (রাছিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (যার পবিত্র নাম পবিত্র কোরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে)। অতঃপর (চতুর্থ ব্যক্তি) হিসেবে ঈমান গ্রহণ করেন হযরত আবুবকর সিদ্দিক

(রাছিয়াল্লাহু তা'লা আনহু)। আর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাছিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র ঈমান আনয়নের সাথেই তিনি সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণের কথা তথা ইসলাম গ্রহণের বিষয় প্রকাশ করলেন এবং তিনি লোকদেরকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র দিকে আহ্বান করেন। ফলে তাঁর এমন স্বতঃস্ফূর্ত আহ্বানে মক্কার অভিজাত ব্যক্তিবর্গ তথা হযরত 'যোবাইর ইবনুল আওয়াম' 'ওসমান বিন আফফান' 'ত্বালহা বিন উবায়দিলাহ' 'সা'দ' 'আব্দুর রহমান বিন আওফ' (রিদ্বোয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈন) প্রমুখ প্রখ্যাত সাহাবীগণ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন।” (সূত্র:-(১) দালায়িলুন নবুয়ত ২/১১৬-১১৭.হাদিস নং-৪৭৮ কৃত ইমাম বায়হাক্বি (রহঃ)। (২) খাসায়িসুল কোবরা ১/৭৭(উর্দু) কৃত ইমাম সূয়ুতী (রহঃ) (৩) জামিউল মু'জিয়াত পৃ:-১৪) (৪) উসুদুল গা-বাহ-২/২৪৯ কৃত ইবনুল আসির। (৫) আলইসাবাহ-২/১৫২ কৃত-ইবনুল হাজর। (৬) আততারিখু দামিশ্ক ৩০/৩৬ কৃত-ইবনে আসাকির। (৭) তারিখুল ইসলাম-১/৩২ কৃত-ইমাম আযযাহাবি (আলাইহিমুর রাহমাহু)। (৮) ইবনু কাছির 'আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া' ২/২৫-৩৪ নং পৃষ্ঠায় হাদিস নং-১২৬০-১২৮৯ পর্যন্ত মোট ত্রিশ খানা হাদিস পেশ করেছেন, এতে কতক বর্ণনা দ্বারা পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন হযরত 'আবু বকর সিদ্দিক', কোনো বর্ণনা মতে 'আলি বিন আবি ত্বালিব', কোনো বর্ণনা মতে 'যায়েদ বিন হারেসা' (রিদ্বোয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন) প্রমুখ সাহাবীর বর্ণনা রয়েছে। ইত্যাদি।

শিক্ষা:-উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে মহান আল্লাহ তা'আলা তদীয় হাবিব, আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী করেই প্রেরণ করেছেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাছিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবীজির অদৃশ্য জ্ঞানের মু'জিয়া দেখেই ঈমান আনেন। সুতরাং, আরো প্রমাণিত হলো খোদা প্রদত্ত অদৃশ্য জ্ঞান বা 'ইলমে গায়ব' হলো নবুয়তের মহান প্রমাণ এবং একটি উজ্জ্বল মু'জিয়া।

মু'জিয়া:-[২] দোলনায় কথা বলা:

ইমাম বায়হাক্বি (রহঃ) এবং আল্লামা ছাবুনী 'আলমায়েতীন' গ্রন্থে, খতীব বাগদাদী এবং ইবনে আসাকির স্বীয় তারিখ গ্রন্থে হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মোত্তালিব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি একদা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার নবুয়তের অনেক উজ্জ্বল নিদর্শনাবলি আমাকে আপনার প্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে, তৎমধ্যে হতে একটি হলো এই 'আমি আপনাকে শিশু অবস্থায় দোলনায় থেকে চন্দ্রের সাথে কথা বলতে দেখেছি এবং স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা চন্দ্রকে যদিকে ইঙ্গিত করতেন চন্দ্র সেদিকেই ঝুকে পড়তো, উত্তরে

রাহমাতুল্লিল আলামিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: 'আমি চাঁদের সাথে কথা বলতাম এবং চাঁদও আমার সাথে কথা বলতো এবং আমি যখন দোলনায় থেকে কান্না করতাম চন্দ্র আমাকে আনন্দ দান করতো, এমনকি চন্দ্র যখন মহান আল্লাহর আরাশের নিচে সিজদারত অবস্থায় থাকতো আমি তার তখনকার পঠিত তাসবিহসমূহ শুনতে পেতাম। সূত্র:-খাসায়িছুল কোবরা, পৃ:-১৩৭ (উর্দু) কৃত: ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দিন সূয়ুতী (রহঃ)।

শিক্ষা: উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো আমাদের মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দোলনায় থাকাবস্থায়ও নবী ছিলেন এমনকি এ ইহ জগতে শুভাগমনের পূর্বেও তিনি নবী ছিলেন। আর যাদের দাবি তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সে নবী হয়েছেন তাদের দাবি মিথ্যা। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন “দেখ আমিনা মায়ের কোলে-দোলে শিশু ইসলাম দোলে, কচি মুখে শাহাদাতের বাণী সে শোনায়”।

**মু'জিয়া:-[৩]: দোলনায় কথা বলা: হাফিয আবুল ফদল ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) স্বীয় ফতহুল বারী শরহে সহীহুল বুখারী গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন; প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিশু অবস্থায় জন্মলগ্নেই কথা বলেছেন। ইবনে সাবআ স্বীয় 'আল খাসায়িস' গ্রন্থে বর্ণনা করেন; মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে দোলনায় ফিরিশতাগণ দোলা দিতেন এবং সর্বপ্রথম মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় নুরানী রসনা দ্বারা মহান প্রভুর প্রশংসা উচ্চারণ করলেন- (আল্লাহু আকবারু কাবি-রান, ওয়াল্ হামদু লিল্লা-হি কাছিরান) সূত্র:-খাসায়িসুল কোবরা, পৃ:-১৩৭ (উর্দু)

শিক্ষা: দোলনায় থেকে কথা বলেছেন হযরত ঈসা (আলাইহিসসালাম) যার সবিস্তার আলোচনা পবিত্র কোরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে, আর ঐ মহান মু'জিয়াও আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র নিকট বিদ্যমান ছিল এক কথায় সকল নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম)'র প্রাপ্ত সকল মু'জিয়ার ভান্ডার হলেন আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাঈল আন্ নিবহানি (রহঃ) প্রণীত 'হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন ফি মু'জিয়া-তি সায়িদিল মুরসালিন'- পৃ:-৬৭

মু'জিয়া:-(৪) নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র শুভাগমন মুহূর্তে সংগঠিত মু'জিয়া:

(ক) খাজা আব্দুল মুত্তালিবের বিরল স্বপ্ন:

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র দাদাজান হযরত খাজা আব্দুল মুত্তালিব থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র শুভাগমনের রাতে আমি কা'বা ঘরের ভেতরে ছিলাম। যখন অর্ধরাত হলো দেখতে পেলাম পবিত্র কা'বা অংশ মক্কারে ইব্রাহীমের দিকে

ঝুঁকে পড়ছে এবং সাজদাবনত হয়ে পড়ল। সবিশেষ সেখান হতে এভাবে তাকবীরের শব্দ ধ্বনিত হচ্ছিল- (আল্লাহ্ আকবারু আল্লাহ্ আকবারু রাব্বু মুহাম্মাদিনিলা মুস্তাফা আল্‌আ-না ক্বাদ ত্বাহ্‌হারানী রাব্বী মিন আনজা-ছিল আছনা-মি ওয়া আনজা-ছিল মুশরিকী-না)

অর্থাৎ: আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বাধিক মহান, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র মহান প্রভু। এখন অবশ্যই আমার মহান প্রভু আমাকে প্রতিমারাজির অপবিত্রতা ও মুশরিকদের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করলেন অদৃশ্য হতে-এভাবে ঘোষণা আসতে লাগল- কা'বার মহান প্রভুর শপথ! কা'বাকে চয়ন করা হয়েছে এবং আরো শোন! মহান আল্লাহ তা'আলা কা'বাকে ক্বিবলা করে আপন ঘরের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। যে সকল প্রতিমা পবিত্র কা'বা গৃহের ভেতর ছিল, সেগুলো ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ল। তথাকার প্রসিদ্ধ ও বৃহদাকার এক খানা মূর্তি ছিল যা 'হবল' রূপে পরিচিত, তাও মুখ খুবড়ে পড়ে রইল এবং পবিত্র কা'বার অভ্যন্তরীণ অঙ্গ থেকে শব্দ ধ্বনিত হচ্ছিল "(হে মানব-দানব শোন) হযরত আমিনা (রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)'র ঘরে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী, রাহমাতুল্লিল আলামিন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুভাগমন করেছেন এবং ওই মহান রহমতের বারিধারা অবতীর্ণ হয়েছে"। (মাদারিজুন নবুয়ত ১ম খন্ড কৃত আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী রহ.)

মু'জিয়া নং-(৫) (খ):-খাজা আব্দুল মুত্তালিব'র বিরল স্বপ্ন:

ইমাম হাফেজ আবু নুয়াইম (রহঃ) স্বীয় দালায়িলুন নবুয়ত গ্রন্থে আবু বকর বিন আব্দুল্লাহ বিন আবুল জাহম স্বীয় পিতা থেকে তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (দাদা) বলেন: আমি খাজা আব্দুল মুত্তালিব তদীয় পুত্র আবু তালিবের নিকট নিম্নোক্ত স্বপ্ন বর্ণনা করতে শুনেছি, আব্দুল মুত্তালিব বর্ণনা করছেন, যখন আমি একদা হাজারে আসওয়াদ সন্নিকটে ঘুমন্তাবস্থায় ছিলাম তথায় এক বিরল স্বপ্ন দেখলাম। যার দ্বারা আমার দেহপানে অত্যধিক ভীত স্বভাব ঘুরপাক খাচ্ছিল, আর আমি একান্ত নিরুপায় হয়ে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলাম। অতঃপর আমি একজন কুরাইশি গণকের স্মরণাপন্ন হলাম এবং তাকে বললাম, আমি আজ রাতে এক বিরল স্বপ্ন দেখলাম। আর তা হল একটি বৃহৎ আকার বৃক্ষ দেখলাম, বৃক্ষটির উচ্চতা আকাশ পর্যন্ত তার শাখা-প্রশাখাগুলো পৃথিবীর পশ্চিম-পূর্ব দিক পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল এবং উক্ত বৃক্ষটিকে সূর্যের কিরণের চেয়ে সত্তর গুণ বৃদ্ধি অবস্থায় আলোকিত দেখেছি এবং আরব-অনারব সকল জনগোষ্ঠীকে উক্ত বৃক্ষসমীপে সাজদাবনত দেখলাম এবং আমি আরো দেখলাম উক্ত বৃক্ষটি তার মহত্ব-গুণাবলির বহিঃপ্রকাশে পুরো জগতকে আলোকিত ও সবুজ-শ্যামলে সুশোভিত করে নিল, তার এক প্রান্ত গুটিয়ে যাচ্ছে এবং অন্য প্রান্ত দ্রুত প্রকাশিত হচ্ছে। আমি আরো দেখতে পেলাম কুরাইশদের একটি বাহিনী ঐ

বৃক্ষটিকে আঁকড়ে ধরল এবং তাদের অন্য বাহিনী বৃক্ষটিকে কেটে ফেলার জন্য উদ্যত হলো, এমনকি তারা ঐ বৃক্ষটিকে কাটার জন্য প্রচুর শক্তি প্রয়োগ করে তার নিকটবর্তী হলো এবং তথায় এমন এক অবয়ব চেহারা বিশিষ্ট অতীব সুন্দর আকৃতি সম্পন্ন, অত্যন্ত পুতঃপবিত্র, অত্যধিক সুগন্ধিযুক্ত একজন সু-কাঠামো সম্পন্ন যুবক দেখলাম! এমন আকৃতির লোক অতীতে আর কখনো দেখিনি। ঐ যুবকটি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে কুরাইশদের উদ্যত দলটির কোমরে আঘাত করতে লাগল এবং তাদের চোখ উপড়ে ফেলছিল। অতঃপর আমি খুব আবেগাপ্ত হয়ে অত্যন্ত ভক্তির সাথে ঐ বৃক্ষটির কিছু অংশ নেওয়ার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হলাম এবং হাত বাড়ালাম, কিন্তু সফল হলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'কোন ব্যক্তি এই বৃক্ষ হতে ফল নিতে পারবে?' উত্তর আসলো 'যারা ঐ বৃক্ষটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে'।

খাজা আব্দুল মুত্তালিব বর্ণনা করছেন, উক্ত 'খ্রীস্টীয় গণক' আমার স্বপ্নের বিবরণ শুনতেই তার অবয়ব মুখ-বিষণ্নাবস্থায় দেখলাম। অতঃপর গণক আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে করলেন, "হে আব্দুল মুত্তালিব! যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়, তবে জেনে রাখ তোমার পৃষ্ঠ তথা বংশ হতে এমন এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে যিনি এ পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের রাজত্বকারী হবেন। সৃষ্টি জগতের একটি অংশ তার মহান অনুপম আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তার একান্ত অনুগত হবে"। এরপর খাজা আব্দুল মুত্তালিব স্বীয় পুত্র আবু তালিবকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "হয়তো তুমিই হবে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য"। আবু তালিব প্রায়ই একথাটুকু অত্যধিক বর্ণনা করতেন, প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র শুভাগমনের পর একথা বলতেন, "আল্লাহর শপথ! ঐ মহান বৃক্ষটিই হলো আবুল ক্বাসিম আল্‌ আমিন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। এর পর কতিপয় মুসলমান আবু তালিবকে প্রশ্ন করলেন: "তবে তুমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উপর ঈমান গ্রহণ করছনা কেন?" আবু তালিব উত্তর এটাই দিতেন "আমার খুব লজ্জা হয় যে কুরাইশর বলবে আবু তালিব পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে ভ্রাতৃপুত্রের উপর ঈমান এনেছে"।

**আবু তালিব হলেন হযরত আলী (রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র পিতা, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রাণপ্রিয় চাচা, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র অন্যতম সংকটাপন্ন মুহর্তের একান্ত সঙ্গী, তাঁর ঈমান আনয়নের বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে, তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এর মতে তাঁর ঈমান আনয়নের বিষয়ে নিরবতা পালন শ্রেয়, যেহেতু পরকালে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র শাফায়াত দ্বারা উপকৃত হওয়ার কথাও নির্ভরযোগ্য হাদিসে বর্ণিত রয়েছে। (সুত্র-খাসায়িছুল কুবরা, উর্দু-১০২)

ওয়াসীলা গ্রহণ : একটি ইসলামী বিধান

• মাওলানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ •

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কুরআনের আলোকে ওয়াসীলা গ্রহণ

পবিত্র কুরআন মাজীদের বেশ কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য ওয়াসীলা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। নিম্নে তা থেকে কয়েকটি আয়াত উপস্থাপন করা হলো-

এক. ওয়াসীলা তালাশের হুকুম

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। আর তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য ওয়াসীলা তালাশ করো। তোমরা তাঁর রাস্তায় জিহাদ করো। যাতে তোমরা সফলকাম হও। [সূরা মায়িদা আয়াত ৩৫]

এ আয়াতে চারটি বিষয়ের উল্লেখ আছে। এক. ঈমান দুই. তাকওয়া তিন. ওয়াসীলা তালাশ চার. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।

সর্বপ্রথম ঈমানের কথা বলা হয়েছে। ঈমানের পরে তাকওয়ার কথা। কেননা, যার অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় চলে আসে তার প্রত্যেক কদম আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের উপর থাকে। আল্লাহ তাআলার হুকুমের অনুকরণ তার জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হয়। তাকওয়ায় ইলাহীর কারণে সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করে।

আয়াতের তৃতীয় হুকুম হলো ওয়াসীলা তালাশ করা। কোন কোন আলেম এ আয়াত থেকে ওয়াসীলা বলতে ঈমান ও সৎকর্মকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে বলে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ উলামা এ থেকে নবীগণ, রাসূলগণ ও বুয়ুর্গ ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তাঁদের মতে 'ইত্তাকুল্লাহ'-এর মধ্যে ঈমান ও সৎকর্ম সবই বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতাত্মক দ্বারা আল্লাহ তাআলা সৎকর্ম উদ্দেশ্য করেন নি। বরং এ আয়াতাত্মক দ্বারা আল্লাহ তাআলার বিশেষ নৈকট্য অর্জন উদ্দেশ্য। আর এ কারণে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী এ দ্বারা কামিল মুর্শিদের বায়াতের কথা বলেছেন। মাওলানা রুমীও তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন, মাওলভী কখনো মাওলানা রুমী হতে পারত না, যদি তিনি শামস তিবরীয়ীর গোলাম না হতেন।

এ আয়াতে চতুর্থ হুকুম জিহাদ। আল্লাহ তাআলার দীনকে বুলন্দ করার জন্য প্রচেষ্টা। সুতরাং উম্মতের মধ্যে ঈমান, তাকওয়া ও জিহাদ যেভাবে শরঈ জিনিস সেরূপ ওয়াসীলা গ্রহণ করাও শরঈ জিনিস। আয়াতে বর্ণিত চারটি বিষয়ের মধ্যে একটিকে শির্ক ও বাকী তিনটিকে শরীয়ত সম্মত বলা কোন বিবেকবান মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

দুই. ওয়াসীলা তালাশ বৈধ

পবিত্র কুরআন মাজীদের আরেক স্থানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

এসব লোক যাদের ইবাদত করে (অর্থাৎ, ফিরিশ্তা, জিন, হযরত ঈসা, হযরত উযাইর (আঃ) এবং এদের ছবি বানিয়ে পূজা করে) তারাতো তাদের প্রভুর কাছে ওয়াসীলা তালাশ করে। তাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার দরবারে কে বেশি প্রিয়? তারা নিজেরাই (ফিরিশ্তাসহ নবীগণ) তাঁর রহমতের ভিখারী, তারা তাঁর আযাবকে ভয় করে। (এখন তোমরা বলো তারা কীরূপে মাবুদ হবে?) নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার আযাব ভয়ের বিষয়। [সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত ৫৭]

জাহেলী যুগে মুশরিকরা জিনদের ছবি, হযরত ঈসা (আঃ) এর ছবি হযরত উযাইর (আঃ) এর ছবি নিয়ে মূর্তি বানিয়ে তাদের পূজা করত। ইসলাম ধর্মপূর্বে জিনরা ভূত ও মূর্তির ভিতরে ঢুকে আশ্চর্য রকমের কর্মকাণ্ড করত। মূর্তিদের বিভিন্ন প্রকারের কর্মকাণ্ড দেখে সাধারণ মানুষ এসবের ইবাদত করত। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হলে জিনরা তাদের এসব কাজ থেকে বিরত হয়ে অনেকেই মুসলমান হয়ে যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ এ আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনা করে বলেন, এ আয়াতটি আরব দেশের এক শ্রেণীর লোকের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। যারা জিনদের পূজা করত। একসময় জিনরা মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু তাদেরকে যারা পূজা করতো তাদের এ খবর ছিল না। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা যাদের ইবাদত করছো তারাতো কেবল আমি আল্লাহর ইবাদত করে। আর তারা আমার প্রিয়দেরকে ওয়াসীলা হিসেবে তালাশ করছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা এ আয়াতটি নাযিল করেন।^৬

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলার প্রিয়বান্দাদেরকে ওয়াসীলা গ্রহণ করা বৈধ। জিনরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য তাদের চেয়ে যারা আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি প্রিয় তাদের ওয়াসীলা গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাদের আমলই এরূপ। তিন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াসীলা করার হুকুম

পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

হে আমার হাবীব যদি তারা তাদের আত্মার উপর জুলুম করে আপনার দরবারে আসে; আর আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চায় এবং আপনিও যদি তাদের জন্য ক্ষমা চান (অর্থাৎ, আপনার ওয়াসীলায় এবং সুপারিশের কারণে) নিশ্চয় তারা

আল্লাহ তাআলাকে তাওবা কবুলকারী ও দয়ালু হিসেবে পাবে। [সূরা নিসা আয়াত ৬৪]

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে মুমিনদেরকে গোনাহ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে তাঁকে ওয়াসীলা করে আল্লাহ তাআলার দরবারে তাওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেছেন। এ আয়াতের হুকুম কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জীবদ্দশার জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং এ আয়াতের হুকুম এখনো বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত তাফসীরকারক ইবন কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে হযরত আল আতবী রা. এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেন- হযরত আল আতবী রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কবরের পাশে বসা ছিলাম। এসময় এক গ্রাম্য লোক এসে বললো, আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমি শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'প্রিয় হাবীব তারা যখন তাদের আত্মার উপর জুলুম করে আপনার দরবারে চলে আসে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর রাসূলুল্লাহও তাদের জন্য ক্ষমা চান (তাঁর ওয়াসীলা ও সুপারিশের কারণে) তারা আল্লাহ তাআলাকে অবশ্য ক্ষমাশীল ও দয়ালু পায়।' আমি আপনার দরবারে এসে আল্লাহ তাআলার কাছে গোনাহ মাফ চাই এবং আপনাকে আল্লাহ তাআলার কাছে আমার সুপারিশকারী হিসেবে উপস্থাপন করছি। অতঃপর সে একটি কবিতার এ লাইনগুলো আবৃত্তি করল- 'দাফন হওয়া লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনার কারণে এ ময়দান ও টিলা সম্মানিত হয়েছে। আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক সে কবরের উপর যেখানে আপনি শায়িত আছেন। যাতে ক্ষমা ও দয়া পাই।' অতঃপর গ্রাম্য লোকটি ফিরে চলে গেল। এসময় আমার ঘুম আসল। স্বপ্নে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, হে আতবী! গ্রাম্য লোকটিকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও - আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।^৭ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সুপারিশে গোনাহ মাফ হওয়া মানে হলো- তার ওয়াসীলায় গোনাহ মাফ হওয়া।

চার. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ওয়াসীলায় আযাব রহিত হওয়া

পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

আল্লাহ তাআলার কাছে এটি পছন্দীয় নয় যে, তাদের উপর আযাব আসবে যে অবস্থায় আপনি সেখানে আছেন। আল্লাহ তাআলা এ অবস্থায়ও আযাব দিবেন না, যে অবস্থায় তারা আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থী। [সূরা আনফাল আয়াত ৩৩]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা উম্মত থেকে আযাব রহিত করার দুইটি পস্থা বর্ণনা করেছেন- এক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামা উপস্থিত থাকা দুই. আল্লাহ তাআলার কাছে মাগফিরাতে লিপ্ত থাকা।

আয়াতে আল্লাহ তাআলা মাগফিরাতে দুআর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উপস্থিত থাকার কথা বলেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যতদিন রাসূল আছেন ততদিন উম্মতের উপর কোন প্রকারের আযাব আসবে না। কেউ কেউ এ আয়াতকে রাসূলুল্লাহর জীবদ্দশার সাথে নির্দিষ্ট করেন এটি ঠিক নয়। পবিত্র কুরআন মাজীদে এ আয়াতে কোনভাবে বলা নেই যে, তাঁর ইত্তিকালের পরে আযাব আসবে। পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন, তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেও তাঁর ওয়াসীলায় আগেকার জামানার উম্মতরা বিভিন্ন প্রকার কামিয়াবী অর্জন করেছে। ইরশাদ হয়েছে-

অথচ তারা (শেষ নবীর আগমনের ও তাঁর কিতাবের ওয়াসীলায়) কাফিরদের বিরুদ্ধে কামিয়াবীর দুআ করত। [সূরা বাকারাহ আয়াত ৮৯]

এ আয়াত হতে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী উম্মতরা তাঁর ওয়াসীলায় আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করত। যদি তাঁর আগমনের পূর্বে তাঁকে ওয়াসীলা করে দুআ করা বৈধ হয়। তবে তাঁর নিজের উম্মতের জন্য কেন বৈধ হবে না? অবশ্যই এটি বৈধ এবং বড় উত্তম কাজ। (চলবে)

^৬ -বুখারী শরীফ খ.২ পৃ.৬৮৫ হাদীস নং ৪৪৩৮; মুসলিম শরীফ খ.২ পৃ.৪২২

^৭ -ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম খ.২ পৃ. ৩৪৮; শুয়াবুল ইম্মান, লিল বায়হাকী, হাদীস নং ৪১৭৮; ইবন কুদামা, আল মুগনী খ.৩ পৃ. ৫৫৭; নভভী, কিতাবুল আযকার খ.৩ পৃ.৯২; ইবন আসাকির, আত তারীখ, পৃ.৪৬

সূফি উদ্ধৃতি

■ তাসাওউফ হলো মানুষের উন্নত চরিত্রের নিদর্শন। যার চরিত্র বা আখলাক যত বেশি উন্নত, তার তাসাওউফও তত বেশি উন্নত।"

-হযরত শায়খ আবু বকর কেতানী (রহঃ)

■ প্রত্যেক ইবাদতেরই সওয়াব নির্দিষ্ট রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর ওলীদের ইবাদতের সওয়াব নির্দিষ্ট এবং প্রকাশ্য নয় বরং তা আল্লাহর পবিত্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।"

-হযরত আবুল হাসান খারকানী (রহঃ)

তাসাওউফ তত্ত্বে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব

• মোহাম্মদ শায়েস্তা খান •

জ্ঞান হচ্ছে আমল বা কর্মের ভিত্তি, কর্মের নির্দেশক, কর্মকে বিশুদ্ধকারী। যেমনিভাবে কর্মব্যতীত জ্ঞানের কোন উপকারিতা নেই অনুরূপভাবে জ্ঞানহীন কর্মেরও কোন মূল্য নেই।

ইলম ও আমল (জ্ঞান ও কর্ম) একটি অপরটির পরিপূরক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একটি অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না। আর মালিক আল্লাহর পথে পথিক ঈমান আক্বিদা আল্লাহ তায়ালার মারিফত অর্জন ও আল্লাহ তায়ালার সম্ভৃষ্টি তথা এসব কিছু অর্জনের ক্ষেত্রে এবং ত্বরিকত অনুশীলনের সর্বক্ষেত্রে জ্ঞান তার জন্য অপরিহার্য বিষয়।

অতএব ত্বরিকতপন্থী তথা আল্লাহর পথের পথিকদের “সায়ের” বা ভ্রমণের সূচনাতে আক্বিদা সংক্রান্ত জ্ঞান ইবাদত পরিশুদ্ধির জ্ঞান ও সুন্দর আচার-আচরণ ও সঠিক লেনদেন এর জ্ঞান অর্জন আবশ্যিক। আর তিনি (আল্লাহর পথের পথিক) তাঁর সায়েরের মধ্যে কুলবের অবস্থা জ্ঞান, নীতি নৈতিকতার ও আত্মশুদ্ধির জ্ঞানের সর্বদা মুখাপেক্ষী যা থেকে তিনি কোন অবস্থাতেই বেনেয়াজ নন।

আর এই জন্য জরুরী বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা প্রকৃত তাসাওউফ অনুশীলনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বলে বিবেচিত। কারণ তাসাওউফ হচ্ছে ইসলামী আদর্শের পরিপূর্ণভাবে সঠিক বাস্তবায়ন। এ ক্ষেত্রে একজন তাসাওউফপন্থী/অনুশীলনকারী নিষ্ঠাবান হবেন এবং জাহেরী বাতেনী উভয় দিক গুরুত্বসহকারে মূল্যায়ন করবেন জ্ঞান অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমূলক কিছু কুরআন ও হাদীসের বিবরণ উল্লেখ করেছি। যা জ্ঞানের মহিমা ও মহত্ব নির্দেশক।

কুরআনে করীমে জ্ঞানের মর্যাদা: আল্লাহ তায়ালা বলেন; আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ও পরম ক্ষমাশীল” (সূরা ফাতির-২৮)

আল্লাহ তায়ালার বাণী “আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? জ্ঞানবান লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে (সূরা জুমার-০৯)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় আরও উন্নত করবেন। তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত” (সূরা মযাদালাহ-১১)

হাদীস শরীফে জ্ঞানের তাৎপর্য: হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি রাসূলে পাক (দঃ) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথে চলবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন, আর ফিরিশতাগণ জ্ঞান অন্বেষণকারীর উপর সম্ভৃষ্টি হয়ে তাদের জন্য তাঁরা পাখা বিছিয়ে দেন। আর জ্ঞানীদের জন্য আসমান জমীনের সবকিছু এবং এমন কি সমুদ্রের প্রাণীরাও ক্ষমা প্রার্থনা করে দোয়া করেন। ইবাদতকারীর উপর জ্ঞানীর মর্যাদা হচ্ছে সমস্ত নক্ষত্রের উপর চন্দ্রের মর্যাদার ন্যায় আর জ্ঞানীরাই নবীগণের যোগ্য উত্তরসূরী আর নবীগণ (আঃ) দিনার দিরহাম (টাকা পয়সার) উত্তরাধিকারী করেন না তারা জ্ঞানের উত্তরাধিকারী অতএব যে তা গ্রহণ করল সে পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ করল। (তিরমিযি শরীফ, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ)।

হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, নবী করীম (দঃ) ইরশাদ করেন “হে আবুযর! কুরআনে পাকে একটি আয়াত শেখা তোমার জন্য একশ রাকাত (নফল) নামাযের চেয়ে উত্তম। আর জ্ঞানের একটি অধ্যায় শেখা সেটার উপর আমল করা হোক বা না হোক) এক হাজার রাকাত (নফল) নামাযের চেয়ে উত্তম। (ইবনে মাযাহ শরীফ)।

হযরত উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, নবী করীম (দঃ) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন তিন প্রকারের মানুষ শাফায়াত করবেন। নবীগণ, আলেমগণ ও শহীদগণ (ইবনে মাযাহ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূল পাক (দঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দার ব্যাপারে ভাল চান তাকে ধর্মীয় বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানী করেন এবং তাকে সঠিক পথে নির্দেশনামূলক ঐশী জ্ঞান দান করেন।

হযরত আবু বাকার (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (দঃ) কে আমি বলতে শুনেছি যে, তুমি জ্ঞানী হও অথবা জ্ঞান অন্বেষণকারী হও অথবা জ্ঞানের কথা শ্রবণকারী হও অথবা জ্ঞানকে মহৎকারী হও (এ চার প্রকারের যে কোন এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হও) পঞ্চম প্রকারে হয়ো না, যাতে ধ্বংস হয়ে যাও। (অর্থাৎ উপরোক্ত চার প্রকারের কোন এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত না হলে ধ্বংস অনিবার্য)

হযরত আতা (রাঃ) বলেন, আমাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, পঞ্চম প্রকার যেটা আমাদের সময় ছিল না তা হচ্ছে জ্ঞান এবং জ্ঞানীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। (তিবরানী শরীফ, মায়মাউজ যাওয়ায়ের) (১ম খণ্ড-১৬৬ পৃঃ)

জ্ঞান অর্জনের হুকুম বা বিধান

ইসলামী শরীয়তে জ্ঞান অর্জনের হুকুমের দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞান তিন প্রকার- ১. যে জ্ঞানসমূহ অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ২. যে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা নিষিদ্ধ ৩. যে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা মুস্তাহাব।

* যে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঐগুলো আবার দু'প্রকার- ১. ফরযে আইন এ পর্যায়ের জ্ঞান অর্জন করা একান্ত অপরিহার্য অর্থাৎ ফরযে আইন মানে ইসলামী শরীয়তের দায়দায়িত্ব অর্পিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই পালনীয়। কোন প্রকারের জ্ঞান অর্জন করা ফরযে আইন তা সাব্যস্ত করার পূর্বে এ বিষয়ে কয়েকটি মৌলিক কায়দা বা সূত্র উপস্থাপন করা জরুরী মনে করছি তৎমধ্য হতে * যে জিনিসটা ছাড়া কোন ওয়াজিব বিষয় পরিপূর্ণতা পাবে না তা অবশ্যই ওয়াজিব। * জ্ঞান অনুসরণ করে জ্ঞানমূলক বস্তুকে। অতএব যে জ্ঞান কোন ফরজ বিষয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মাধ্যম হয় তা ফরয, যে জ্ঞান কোন ওয়াজিব বিষয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অবশ্যিক হয় তা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে যে জ্ঞান কোন সুন্নত পালনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয় তা সুন্নত। এ কায়দার উপর ভিত্তি করে কিছু নির্দিষ্ট জ্ঞান “মুকাল্লাফ বিশ শরাফ” (শরীয়তের দায়-দায়িত্ব অর্পিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফরযে আইন)।

* আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বিদা দলিল প্রমাণসহ ঈমান সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা যাতে করে ঈমান বিধ্বংসী ইসলাম পরিপন্থী আক্বিদা বিশ্বাসের অন্ধ অনুসরণ থেকে বেরিয়ে আসা যায় এবং নিজের ঈমান আক্বিদাকে বিভ্রান্ত বাতিল আক্বিদাপন্থী ও নাস্তিক খোদাদ্রোহীদের ঈমান বিধ্বংসী ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে যথাযথ হেফাজত করা যায়।

* যে ইবাদতসমূহ ফরয করা হয়েছে যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি সম্পর্কে শুদ্ধ ও পরিপূর্ণভাবে আদায়ের জ্ঞান অর্জন করা।

* যিনি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্য লেনদেন মুয়ামালাত ও পারিবারিক এবং সংসার জীবন নিয়ে আছেন, এতদসংক্রান্ত বেচা-কেনা ভাড়া বন্ধক ইত্যাদি সংক্রান্ত শরীয়তের মাসয়ালা-মাসায়িলের জ্ঞান অর্জন করা ফরয। যাতে করে সে হারাম থেকে বাঁচতে পারে এবং শরীয়তের সীমারেখায় নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারে।

আত্মার অবস্থা যথা তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর উপর ভরসা করা। খোদাভীতি রেযা বা আল্লাহর সন্তুষ্টি ইত্যাদির জ্ঞান অর্জন করা ফরযে আইন কারণ একজন মুসলমান তার জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে আত্মার এই অবস্থাসমূহের সম্মুখীন হয়।

* চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ: ভাল-মন্দ সব কিছুর জ্ঞান অর্জন করা ফরয যাতে করে চারিত্রিক ভাল গুণাবলী যথাযথ বাস্তবায়ন করা যায় এবং মন্দগুলো যেমন অহংকার, দাঙ্কিতা, কৃপণতা, হিংসা, বিদ্বেষ, লোক দেখানো পরনিন্দা-পরচর্চা ইত্যাদি চারিত্রিক দোষ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা যায়।

আর এই জন্য এ সমস্ত মন্দ স্বভাব ত্যাগের ক্ষেত্রে দৃঢ়প্রত্যয়ে চেষ্টা করা হয়। কারণ মন্দ স্বভাব থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। আর এ কাজটা চারিত্রিক ভাল গুণাবলী ও মন্দ স্বভাব যথাযথ পরিচয় ছাড়া অর্জন করা সম্ভব না।

এক্ষেত্রে সফলতার জন্য আবশ্যিক যে, আল্লাহর প্রিয়ভাজন নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের সাধনার নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া। এ জন্য ইমামুত তুরীকত হযরত আবুল হাসান শাজলী (রহঃ) বলেন, “যে ব্যক্তি আমাদের তুরীকতের জ্ঞানের গভীরে না পৌঁছে মৃত্যুবরণ করে অর্থাৎ (তুরীকতের জ্ঞান অর্জন তদনুযায়ী আমল ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে) সে কবীরা গুণাহে লিপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করল অথচ সে তা অনুধাবনও করতে পারেনি। আর কবীরা গুণাহ হচ্ছে সব ধরনের অশ্লীলতা সেটার জাহেরী বা প্রকাশ্য কবীরা গুণাহ হচ্ছে যা মদ্যপান ইত্যাদি আর বাতেনীগুলো হচ্ছে আত্মা সংক্রান্ত কবীরা গুণাহ যেমন অহংকার, মুনাফেকী, দাঙ্কিতা ইত্যাদি। আর এ জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই মর্মে নিষেধ করেছেন যে, “তোমরা, অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না সেটা প্রকাশ্য হোক অথবা অপ্রকাশ্য হোক” (সূরা আনয়াম-১৫১)।

মানুষ সাধারণত প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে এর ক্ষতিকারক দিকগুলো বুঝতে পেরে তা থেকে তওবা করে, পক্ষান্তরে বাতেনী অশ্লীলতা বা অপ্রকাশ্য কবীরা গুণাহে যুগের পর যুগ লিপ্ত থাকলেও তা থেকে তওবা করার কথা চিন্তা করে না কারণ সে এর বিধান সম্পর্কে জানে না এবং এগুলোর ভয়াবহ পরিণতিও সে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই সুফিয়া-ই কিরাম যে জ্ঞান অর্জন ও অনুশীলনে আত্মশুদ্ধির চরম সীমানায় পৌঁছেন সে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।

সুফিবাদে 'ইশ্ক' শব্দের প্রয়োগ ও চর্চা

• অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান •

পুরো বিশ্ব সাহিত্য জুড়ে 'ইশ্ক' বা 'মুহব্বত' শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সুফি সাহিত্যে 'ইশ্ক', 'মুহব্বত' কিংবা 'ভালবাসা' শব্দের ব্যবহার, প্রয়োগ এবং চর্চার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। অত্যন্ত সুন্দর, প্রাঞ্জল ও আধ্যাত্মিকতার অনুপম ছোঁয়ায় 'ইশ্ক' শব্দটি সুফি সাহিত্যে স্থান দখল করে আছে। জান্নাতি আবহে এক অনুপম ছন্দময়তার উৎকৃষ্ট ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় 'ইশ্ক' শব্দের ব্যবহারে। এ প্রবন্ধে 'ইশ্ক' শব্দটির যথার্থ ব্যবহার সংক্ষেপে পাঠক সমীপে উপস্থাপন করা হলো।

জাগতিক সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে অন্তরে অফুরন্ত মুহব্বত ধারণ করে মহান রাক্বুল আলামিনের সম্ভ্রষ্ট অর্জনের মধ্যেই সুফিবাদের মূল ভাব নিহিত রয়েছে। ইহলৌকিক প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার মাঝে একটি সীমারেখা রয়েছে। নির্দিষ্ট সীমা রেখা অতিক্রম করলে বিপদ নির্ধারিত। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত মু'মীনের অন্তরে জাগ্রত ঐশী প্রেম এক অনন্ত দরিয়া। সুফিবাদের অন্যতম প্রধান উপাদান হল ঐশী প্রেম যা মু'মীনের অন্তরকে আলোকিত করে। আল্লাহর প্রেমে পাগল সেই ঐশী প্রেমিক মহান রাক্বুল আলামীনের নূরের জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে অনাবিল প্রশান্তি অনুভব করে যা এ পার্থিব জগতে যে কোন ধরণের সুখ বা আনন্দকে হার মানায়। সুফিতত্ত্বের মর্ম মতে ঐশী প্রেম হল প্রকৃত প্রেম যা এক অকৃত্রিম ভালবাসার নাম। আল্লাহর ইবাদত হতে হবে প্রেমের মাধ্যমে। ঈমান হচ্ছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি অকৃত্রিম মুহব্বত বা ভালবাসার নাম। অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে বেহেশতের সর্বোচ্চ মকাম পর্যন্ত কেবল 'ইশ্ক' 'মুহব্বত' বা 'ভালবাসার' ব্যবহার ও চর্চা বিদ্যমান।

একজন সুফি সাধক সাধনার উচ্চস্তরে পৌঁছে তাঁর ঐশী প্রেমিকের প্রতি এক পত্র রচনা করেন। ঐ পত্রে তিনি লিখেনঃ

“প্রেমের অস্তিত্বকে বিদ্যমান রাখা চাই

আর তা যদি নাও থাকে তাতে কোন ভয় নাই,

আগুনে পুড়ে যেমনি খাঁটি হয় স্বর্ণ

সে রূপে খাঁটি হয় মুমীনের মন ও বর্ণ”

সুফি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতার জয়গান ব্যক্ত হয়েছে 'ইশ্ক', 'প্রেম', 'ভালবাসা', 'মুহব্বত' ইত্যাদি শব্দের সঠিক প্রয়োগ ও চর্চার মাধ্যমে। আধ্যাত্মিক জগতের মুহব্বত সে তো এক

অনন্ত মহাসাগর, অনন্য প্রেমানুভূতি যা সত্যিকার প্রেমিককে ব্যাকুল করে তোলে।

'ইশ্ক' শব্দটি নির্গত হয়েছে 'আশাগেহ্' শব্দ হতে। 'আশাগেহ্' শব্দের অর্থ 'আঙ্গুর'। আঙ্গুর ফল অপর একটি গাছের সাথে জড়িয়ে থাকে। যতক্ষণ না এ ফলটি পাকাপোক্ত হয় অথবা হলুদ বর্ণ ধারণ করে ঝরে পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি অন্য গাছের সাথে নিজকে আগলিয়ে রাখে এবং ঐ গাছ থেকে আহার গ্রহণ করে থাকে। শব্দগত এবং ব্যবহারগত দিক থেকে 'ইশ্ক' শব্দটির ব্যাখ্যা দাঁড়ায় আশিক তার মাশুককে ইশ্কের জালে এমনভাবে আটকিয়ে রাখে যেন সে ছুটে যেতে না পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে মন্জিলে মাকসুদে না পৌঁছে ততক্ষণ পর্যন্ত একে অপরকে জড়িয়ে রাখে। আশিক আর মাশুকের রুহানী সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। আশিক তার মাশুককে 'ইশ্ক' নামক অনন্ত দরিয়ায় আঙ্গুর ফলের লতা গাছের মত জড়িয়ে রাখে শুধু পাকাপোক্ত হওয়ার লক্ষ্যে। যে মাত্র সে আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে পৌঁছে গেল, আশিক-মাশুক থেকে জাগতিকভাবে আলাদা হয়ে গেল, আর একে বলে ঐশী প্রেম।

সুফি সাধক আল্লামা জালালুদ্দিন রুমী (রহঃ) বলেন, “মুহব্বত সকল ব্যথাকে প্রশমিত করে”। তিনি আরো বলেন, “মুহব্বত এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন ঔষধ নেই” অর্থাৎ তাঁর মতে 'ইশ্ক' বা 'মুহব্বত' হল সকল রোগের মহৌষধ।

সুফিবিদদের মতে, আল্লাহকে পাওয়া যায় প্রেমের মাধ্যমে। আর মানব কুলকে হতে হবে আল্লাহর প্রেমিক, তাহলেই সে হবে সার্থক, পরিণত হতে পারবে ইনসানে কামিলে।

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা আল্লাহকে ভালবাসেন।” সুতরাং, আল্লাহ যাদেরকে ভালবাসেন তাদের মত ভাগ্যবান আর কে হতে পারে?

রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর দিদার লাভ করার বাসনা রাখে, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন, আর যে আল্লাহর দীদার লাভের বাসনা রাখে না আল্লাহ তাকে ভালবাসেন না।”

অনেকে মনে করে যে, আল্লাহর প্রতি মুহব্বত স্থাপন করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। যারা এরূপ ধারণা পোষণ করে তারা আল্লাহর প্রেমের হাকীকত মোটেই বুঝতে পারে না, অবশ্য

এটি বেশ জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়ও বটে। আখিরাতের কল্যাণের জন্য মুহব্বতে ইলাহী জরুরী। বিশেষতঃ তরীক্বতের ভাইদের জন্য মুহব্বতে ইলাহী অপরিহার্য।

‘ইশ্ক’ বা ‘মুহব্বত’ এর সংজ্ঞা ব্যাপক। কোন বস্তুকে ভাল বা উত্তম মনে হওয়ার ফলে মানুষ ঐ বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই আকৃষ্ট হওয়ার নামই মুহব্বত বা ভালবাসা, আর ভালবাসা গভীর হলে তাকে বলে ‘ইশ্ক’ বা প্রেম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা অধিক ভালবাসা থাকবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ঈমান পূর্ণ হবে না।’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, “তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের চেয়ে অধিক পরিমাণ আমাকে ভালবাসবে না।”

হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) বলেন, “যে ব্যক্তি একবার আল্লাহর মুহব্বতের স্বাদ পেয়েছে, দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রতিই তার অনুরাগ থাকতে পারে না।” আল্লাহর অসীম রহমত, শক্তি, অনন্ত কুদরত ও মহিমাসমূহ চিন্তা করলে অন্তরে আল্লাহর প্রেম জাগ্রত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “অন্তরে আল্লাহর প্রতি মুহব্বত পয়দা কর যেহেতু তিনি তোমাদেরকে রুজি দান করে থাকেন, আর আমার প্রতি মুহব্বত স্থাপন কর, যেহেতু আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন।”

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুফি সাধক হযরত ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহঃ) বলেন, “প্রেমিক যখন প্রেমের সুখ পান করার জন্য প্রেমের পেয়ালা তুলে নেন তখন সারাটি জাহান যেন তার চোখের সামনে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ আঠার হাজার মাখলুকাত প্রেমের অনন্ত সাগরে পরিণত হয়। আর সেই প্রেম সাগর হয় মানবশূন্য, যেহেতু প্রেমিক নিজেই পরিণত হয় প্রেম সাগরে। সেখানে আর ব্যক্তির শরীরি অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকেনা।”

অধ্যাত্ম প্রেমের গল্প সুফি সাহিত্যকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করেছে। সুফিদের মতে, জীবনের অস্তিত্ব সৃষ্টির মূলে রয়েছে ‘ইশ্ক’ যা প্রেমিককে প্রেমের আগুনে পুড়ে অঙ্গার করে ফেলে।

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী (রহঃ) বলেন,

“আধ্যাত্মিক প্রেম এমন এক অসাধারণ মহাসাগর
যা ঐশী প্রেমের একটি মাত্র পেয়ালার মধ্যে স্থান করে নিতে

পারে,

প্রেম মহান পর্বতকে ধুলি কণায় পরিণত করতে পারে,
প্রেম জান্নাতের মোহকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলতে পারে,
প্রেম পুরো পৃথিবীতে কম্পন ধরাতে পারে,
সত্যিকার ঐশী প্রেমই এ পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চারণ করতে পারে।”

যেহেতু ‘প্রেম’, ‘ইশ্ক’, ‘মুহব্বত’ বা ‘ভালবাসা’ অদৃশ্য বিষয়, এটা কারো একার পক্ষে ধরে রাখা কিংবা এটার মালিকানা অর্জন করা সম্ভব নয়। সত্যিকার প্রেম বা মুহব্বত একান্তই অন্তরের ব্যাপার। এ অদৃশ্য জান্নাতি আবহ যে নিজের অন্তরে জাগ্রত করতে পেরেছে সে-ই প্রকৃত প্রেমিক বা আশিক। মাইজভাগুরী মরমী কবি রমেশ ভাগুরী বলেন,

“মাওলার ইশ্কের মামেলা বুঝার সাধ্য আছে কার
ইশ্কেতে মজিয়া প্রভু সৃজিল সংসার”

তিনি আরো বলেন,

“করণেতে ওয়াজ করণী, নবীর দস্ত পড়ে গুনি
সর্বদস্ত ফেলে দিল ইশ্কে আপনার”

আল্লাহ আমাদেরকে ‘ইশ্ক’ শব্দের মর্মার্থ বুঝার তৌফিক দান করুন। আমিন!

সুফি উদ্ধৃতি

চোখের পর্দাই হল সর্বাপেক্ষা বড় পর্দা, যার দ্বারা লোক শরীয়তবিরোধী কাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

খাদ্য ভর্তি উদরে কখনও জ্ঞান ও বুদ্ধির স্থান হয় না।

পরহেজগারীর ধনে যার অন্তর পূর্ণ, সেই বড় ধনবান।

—হযরত য়ুনুন মিসরী (রহঃ)

আরিফের জন্য যা অবশ্য পালনীয়, তা হল মাল-দৌলতের প্রতি নিষ্পৃহ থাকা, বেহেশতের ভরসা না রাখা ও দোযখের পরোয়া না করা।

—হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)

ধর্মের দাবীর সাথে নৈতিকতার ব্যবধান

• এস এম সেলিম উল্লাহ •

(দ্বিতীয় পর্ব)

আমানত ও প্রতিজ্ঞার সম্পর্ক মানুষের সাথে দু'দিক থেকেই হয়। (১) আল্লাহর আমানত ও প্রতিজ্ঞা, (২) মানুষের সাথে মানুষের আমানত ও প্রতিজ্ঞা। যেমন কুরআন পাকে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘আমি তো আসমান জমিন ও পর্বতমালার প্রতি আমানত অর্পণ করিয়াছিলাম, তাহারা তাহা বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং উহাতে শংকিত হইল। কিন্তু মানুষ উহা বহন করিল সেতো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ।’ (সূরা আহযাব আয়াত-৭২)

‘আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার কর তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে করবে। আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা।’ (সূরা নিসা ৫৮ নং আয়াত)

উপরে উল্লেখিত খোদার দিকে সম্পর্কিত আমানতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তফসিরকারকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। যেমন শরীয়তের ফরজ কর্মসমূহ, সতীত্বের হেফাজত ইত্যাদি। যেগুলো পুরোপুরি পালন করলে জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত এবং বিরোধিতা অথবা ক্রটি করলে জাহান্নামের আযাবের প্রতিশ্রুতি।

সার কথা এই যে আমানত দ্বারা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা বুঝায়। যা বিশেষ স্তরের জ্ঞান বুদ্ধি ও চেতনার উপর নির্ভরশীল। যেমনটা আল্লাহ বলেন, প্রতিনিধিত্বের কথা—

‘তিনি পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিনিধি করেছেন।’ (সূরা-ফিতর ৩৯নং আয়াত)

‘নিশ্চয় পৃথিবীতে আমি প্রতিনিধি সৃষ্টি করেছি।’ (সূরা-বাকারা ৩০নং আয়াত)

উন্নতি এক খোদায়ী প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এই বিশেষ যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল যেসব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এ যোগ্যতা নেই তারা স্বস্থানে যতই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তারা তাদের স্থান থেকে উন্নতি করতে পারে না। এ কারণে আকাশ পৃথিবী এমনকি, ফিরিশ্তাগণ এর মধ্যে উন্নতি নেই তারা নৈকট্যেও নিজ নিজ স্থানেই অনড় হয়ে আছে। তাদের অবস্থা এই—

অর্থাৎ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। তাওফী (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, পূর্বে আল্লাহ তায়ালা আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত পেশ করেছিলেন। কিন্তু তারা তা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তা আদম (আঃ) কে পেশ করে বললেন, হে আদম (আঃ)! আমি তো এটা আসমান, যমীন, পাহাড় পর্বতের প্রতি পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা তা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। আচ্ছা তুমি কি তা বহন করতে পারবে? হযরত আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার প্রতিপালক! ওটার বিনিময়ে আমি কী লাভ করব? তিনি বললেন, উত্তম কাজের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার। আর মন্দ কাজের বিনিময়ে শাস্তি। এটা শুনে হযরত আদম (আঃ) তা বহন করতে সম্মত হলেন।

ইবনে জারীর (রাঃ) বললেন, ইউনুস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন— আল্লাহ তায়ালা আসমান যমীন ও পর্বতমালার প্রতি দ্বীনের আমানত পেশ করলেন, এটা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে পুরস্কার দান করবেন এবং ব্যর্থতায় শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিন্তু তারা দ্বীনের এই বোঝা বহন করতে অস্বীকার করল, তারা বলল, আমরা আপনার আদেশের অধীনস্থ হয়ে থাকব। কোন পুরস্কার আমাদের কাম্য নয়। আর শাস্তিও ভোগ করতে চাইনা। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)-এর কাছে পেশ করলেন, তিনি তা মাথায় তুলে নিলেন। ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমানতের বোঝা যখন তুমি বহন করলে তখন আমি তোমায় সাহায্য করব। তোমার চক্ষুর উপর একটি পর্দা সৃষ্টি করব। অন্যায় কোন বস্তুর প্রতি চক্ষুকে তাকাতে দেখলে তুমি তার উপর পর্দা টেনে দেবে। তোমার জিহ্বার উপরও একটি দরজা আমি সৃষ্টি করব। কোন অন্যায় কথা বলবার আশংকা করলে দরজা বন্ধ করে দিবে। তার তোমার লজ্জাস্থানের জন্য আমি পোশাক তৈরি করেছি। অভিধানবেত্তাগণ এ আয়াতে আমানতের ব্যাখ্যায় শরীয়তের কষ্টসমূহ বুঝিয়েছেন। যাতে রয়েছে ইবাদত, নৈতিকতা, চারিত্রিক উন্নতি ইত্যাদি আল্লাহর হুকুম সমূহকে আমানত বুঝিয়েছেন যার ওজন এত ভারি যে আসমান যমীনসমূহ পাহাড়সমূহ তা উঠাতে অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং ভয়ে বিকম্পিত হয়। কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ

করছেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) সুন্দর করে বলেছেন-

‘আল্লাহ্ তায়ালা এ আমানত হযরত আদম (আঃ)-এর উপর যখন পেশ করলেন তখন তার দৃষ্টিতে আমানতের কষ্টের তুলনায় আমানত পেশকারীর ওহাদানীয়তের মাহাত্ম্য বেশি মনে হয়। এ স্বভাব আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয় হয়। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন, হে আদম (আঃ) আমানতের ভার নেওয়া তোমার কাজ আর ওঠানোর শক্তি দেওয়া এবং এটা হেফায়ত করা আমার কাজ।’

সুফিয়া-ই কিরামের দৃষ্টিতে: হযরত আল্লামা পানিপথি (রহঃ) বর্ণনা করেন-এ আয়াতে যে, আমানতের কথা বর্ণনা হয়েছে তা ঐ আমানত যা শুধু মানুষই উঠাতে পারে অন্য কোন সৃষ্টি উঠাতে পারে না। যদি এ আমানতের অর্থ আহকামে শরিয়ত হয় তবে এটা মানবের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব তা প্রমাণ হয় না কেননা আহকামে শরিয়ত জীন এবং ফিরিশ্তাদেরও পালনীয়, তাই জীন ফিরিশ্তাদের শ্রেষ্ঠত্বের সাথে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রাধান্য পায়না। কারণ তাদের শান এটাই যে, অর্থাৎ তারা দিন রাত আল্লাহ্র তসবিহ পাঠে নিয়োজিত কিন্তু মানবের অবস্থা এটা নয়, তাই সুফিগণ আমানতের ব্যাখ্যা জ্ঞানের আলো এবং প্রেমের আগুন করেছেন।

অর্থাৎ-নূরে আকল বা জ্ঞানের আলো দ্বারা আল্লাহ্র মারিফতের সাগরকে আর প্রেমের আগুন দ্বারা, নিজের অজ্ঞতার পর্দা জালিয়ে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছানো, মোট কথা তারা আল্লাহ্র পরিচয় জ্ঞানকে মূলত আমানত বুঝিয়েছেন। আর ফিরিস্তা তার সম্মানিত সৃষ্টি কিন্তু তাদের মকাম নির্দিষ্ট যার থেকে তারা আগে পিছে যেতে পারে না। প্রেমের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করা এটা ইনসানের জন্য প্রযোজ্য।

আল্লামা রুমী বলেন,

(১) মানুষ ব্যতীত এ আমানত কেউ গ্রহণ করেনি কেননা তারা মূর্খ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল।

(২) তাদের অন্ধকারত্ব এ ছিল যে, তারা নিজেদের হাস্তিকে ফানা করে দিল যেন বাকা হাসিল করতে পারে।

(৩) তাদের মূর্খতা এ ছিল যে, তাদের আল্লাহ্ ব্যতীত যা আছে সব কিছু দিলের কবজ থেকে মুছে দিবে।

(৪) এ অন্ধকারত্ব অতি উত্তম যা আইনে আদালত বা অতিব ন্যায়সঙ্গত, আর মূর্খতাবোধ অনেক উপকারী ছিল কেননা এটি মারিফতের মগজ ছিল। আমানত কখন পেশ করা হয়েছিলঃ

আদম (আঃ) সৃষ্টির পূর্বেই আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার

সামনে আমানত পেশ করা হয়েছিল। আদম (আঃ) সৃষ্টির পর তার কাছে এ কথাও প্রকাশ হয়েছিল যে, তোমার পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর সামনেও এই আমানত পেশ করা হয়েছে। তাদের শক্তি ছিল না বিধায় তারা অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। (চলবে)

সুফি উদ্ধৃতি

- আউলিয়াদের পক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা কঠিন কোন কাজ নেই।
- স্বাদে তৃপ্তি আর চেষ্টায় বিশ্বাস এ দুটোকে ত্যাগ করতে পারলেই দাসত্বের হক আদায় হয়।
- নিজেকে নিয়ামতের অনুপযুক্ত বলে ধারণা করাই শোকর বা কৃতজ্ঞতা।
- যে স্থানে মিথ্যা না বললে রক্ষা পাওয়া মুশকিল সে স্থানেও মিথ্যা না বলা প্রকৃত সত্যনিষ্ঠা।
- প্রকৃত ফকীরের লক্ষণ হল সে কারও কাছে কিছু চায় না, কারও সাথে ঝগড়া করে না, কেউ ঝগড়া করতে চাইলেও চুপ করে থাকে।
- ধৈর্য্য মানুষকে বিনা প্রার্থনায় ও বিনা মিনতিতে আল্লাহ্র সাথে লিপ্ত রাখে।
- রুজী-রোজগার উপার্জন না করার নামও তাওয়াক্কুল।
- দোজাহানের কারও চেয়ে নিজেকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ মনে না করা, আর একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও মুখাপেক্ষী না হওয়াই হল নম্রতা বা বিনয়।

—হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)

ইসলামের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান

• ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান •

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নবম শতাব্দীর মুসলিম বিজ্ঞানীদের কথা উল্লেখ করে আবুল ফরাজ বলেন, জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাতের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে এই মনীষীবৃন্দ প্রাকৃতিক রহস্য উদঘাটনের উদয় কামনায় জীবনপাত করেছেন। তাঁরা কেউই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছুই বিশ্বাস করেন নি গ্রহণও করেন নি।^{৬৩} প্রণিধানযোগ্য যে, আমরা বাংলা ভাষায় ‘উলুম আল তাজরিবিয়া’ কে ব্যবহারিক বিজ্ঞান বা অভিজ্ঞতাবাদী বিজ্ঞান বলে থাকি বটে, এবং ইংরেজীতেও আমরা এটাকে Experimental Science বা Empirical Science বলে চিহ্নিত করে থাকি, কিন্তু এতদসঙ্গে আমাদের এটাও নিশ্চিতরূপে মনে রাখা দরকার যে, ব্যবহারমূলে ব্যবহারিক অথবা অভিজ্ঞতামূলে অভিজ্ঞতাবাদী নয়; কিংবা এটা Experience মূলে Experimental অথবা Empiricism মূলে Empirical নয়। বরং এটা তাজরিবিয়ার অনুবাদ মূলে অভিজ্ঞতাবাদী বা Experimental. সুতরাং এগুলো জরিপ বা Survey মূলে অভিজ্ঞতাবাদী বা Experimental বিজ্ঞান।^{৬৪}

কথাটি সঠিকতর পরিষ্কার করার জন্য আমরা তিন প্রকার বিজ্ঞানের কল্পনা করতে পারি; যথা Inductive science, Deductive science ও Experimental science; এগুলোকে আমরা যথাক্রমে Empirical, Rational ও Experimental science-ও বলতে পারি। এক্ষেত্রে এটা প্রতীয়মান হবে যে, Empirical শব্দটি Experimental science এর জন্য প্রযোজ্য নয়। আদতে Empirical জ্ঞান হলো, অভিজ্ঞতাভিত্তিক আনুমানিক জ্ঞান। উদাহরণ স্বরূপ সাম্প্রতিক প্রকাশিত ‘রেখা রাশি রং’ নামে জহিরুল আলমের একটি উদ্ধৃতি দেয়া যায়। বইটির প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম: জীবনের ভিত্তি হলো অনুমান। এতে অভিজ্ঞতাভিত্তিক অত্যন্ত জোরালো যুক্তি দিয়েই গ্রন্থকার প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আমাদের সম্মুখে সমগ্র বিশ্বটা কতগুলো অনুমানের উপর দণ্ডায়মান।

তাঁর যুক্তি তর্কের জের টেনে তিনি বলেন, পুরো বিষয়টাই হলো একটি অনুমান যেমন পুরো দর্শন বিষয়টা। এই অনুমানের ফলে যখন কোনো সত্য ধরা পড়ে যায়, তখনই তা হয়ে যায় আবিষ্কার। এ আবিষ্কার আবার কালের বিবর্তনে

চলে যায় অন্য আবিষ্কারে, পুরানো আবিষ্কার হয়ে যায় অচল, অপাংক্তেয়।^{৬৫}

পূর্বে উল্লেখিত রজার ব্যাকনের ভাষ্যকার, যিনি Experience থেকে Experimental কে derive করার প্রয়াস পেয়েছেন, তিনিও আমাদের মতে এই চিন্তাবিদদের শ্রেণীতে পড়েন। সম্ভবত আরবী ভাষার সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিচিতি না থাকায়, তিনি রজার ব্যাকনের মনোভাব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং বুঝতে ভুল করেছেন- কেনইবা ব্যাকন নতুন বিজ্ঞানের জন্য একটি নতুন ল্যাটিন শব্দ গ্রহণ করার চাইতে ‘উলুম আল-তাজরিবিয়া’ কথাটির আক্ষরিক অনুবাদ করে Scientiae Experimentalis কথাটি খাড়া করেছেন?

মুসলমানদের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান

উপরের বিশ্লেষণ থেকে যে কথাগুলো প্রতীয়মান হয় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

মুসলমানদের বিরামহীন জ্ঞানান্বেষণের চতুরে তাদের ইলম বা জ্ঞানচর্চা গাইবী বিশ্বাসে আরম্ভ হয়। এই গাইবী বিশ্বাসকেই ইংরেজীতে Observation ও বাংলায় ‘পর্যবেক্ষণ’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত জরিপ পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত হয়ে এবং তৃতীয়ত অংক ও এলজেবরার সূত্রে কার্যত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমন্বয়ে একটি জরিপতাত্ত্বিক পদ্ধতির সৃষ্টি হয়। চতুর্থত জরিপতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও তত্ত্বগুলোর যুক্তিসম্মত সমন্বয়ের ও সূত্রায়নের দ্বারা যে বিশেষ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেগুলোর এক এক শ্রেণীবিভাগকে এক-একটি ‘ইলম আল তাজরিবিয়াহ’ ও এরূপ সর্ব বিজ্ঞানাদিকে একত্রে ‘আল-উলুম আল-তাজরিবিয়াহ’ বলা হয়। এটার ইংরেজী অনুবাদই Experimental Sciences ও বাংলা অনুবাদ ‘অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞান’ বা ‘তাজরিবী বিজ্ঞান’ বলা বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞানের বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক সারটন যথার্থই বলেছেন, আমরা কীরূপে মুসলমানদের বিজ্ঞান সঠিকভাবে হৃদয়ংগম করতে সমর্থ হব, যদি আল কুরআনের চতুর্দিকে এর মাধ্যাকর্ষণিক ঘূর্ণনের অবস্থাটি পূর্ণমাত্রায় আমাদের বোধগম্য না হয়। তাদের চিন্তার মাধ্যাকর্ষণ আমাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নতর ছিলো।^{৬৬}

সারকথা, আধুনিক বিজ্ঞান মানে ‘উলুম আল তাজরিবিয়াহ’

যা একটি পদ্ধতিগত বিজ্ঞান এবং এর ভিত্তিমূল হলো বিশ্লেষণ পদ্ধতি অর্থাৎ analytical methodology. মুসলিম পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে কলাবিদ্যা বা আদব হলো নামবাচক বিদ্যা, এর ভিত্তি হলো সংজ্ঞায়ন বা ব্যাখ্যা আর বিজ্ঞান বা ইলম হলো বস্তুবাচক জ্ঞান, এর ভিত্তি হলো সূত্রায়ন ও বিশ্লেষণ।

ইউরোপের সুধী সমাজ বিজ্ঞানের এই বিশ্লেষণমুখী দিকটি অতি বিলম্বে গ্রহণ করেছেন। দর্শনের একটি অতি সাম্প্রতিক বিশ্বকোষে বলা হয়েছে যে, Prescriptive পদ্ধতির স্থলে Analytic পদ্ধতির উদ্ভব তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক সম্ভবত এটা হারশেল কর্তৃক খৃস্টীয় ১৮৩০ সনের দিকে আবিষ্কৃত হয়।^{৬৭}

আল কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের জ্ঞান চার প্রকারের হয়। এক. 'মা-হিয়্যত' সম্বন্ধীয় অর্থাৎ বাস্তব জ্ঞান। দুই. 'মা ইদ্রাকিয়্যত' সম্বন্ধীয় অর্থাৎ দর্শন জ্ঞান। তিন. 'মা লিম্মিয়্যত' সম্বন্ধীয় অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। এবং চার. 'হাকিকত' সম্বন্ধীয় অর্থাৎ সত্য জ্ঞান। এগুলোর প্রশ্ন হলো, যথাক্রমে- কী? কেন? কীরূপে? সত্যগত?^{৬৮}

অতএব 'উলূম আল তাজরিবিয়্যাহ' তিন নম্বরে পড়ে। এটা 'কিরূপ বিষয়ক how ভিত্তিক। এটা পর্যবেক্ষণে আরম্ভ হয় ও সূত্রায়নে পূর্ণতা লাভ করে। দর্শন এর আগের স্তর এবং সত্যজ্ঞান এর পরের স্তর।

^{৬৩} ঐ, পৃ. ১৩।

^{৬৪} The Encyclopaedia of Philosophy, Colliers and Macmillan, vols, 7-8, 1972, p, 340; Scientific method, if it has any univocal meaning, means the right mixture of observation and experiment on the one side and theory construction on the other.

^{৬৫} জাহিরুল আলম: রেখা রাশি নং, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ. ১-৩।

^{৬৬} George Sarton: Introduction to the History of Science, Baltimore, 1972, Vol I, p 5, How can we reach a correct understanding of Muslim science if we did not fully grasp its gravitation around the Quran. we did not fully grasp its gravitation around the Quran. The center of gravity of their thought was radically different from ours.

^{৬৭} The Encyclopaedia of Philosophy, Colliers and Macmillan, 1972, vols, 7-8, 7-8, o. 339, (Scientific) Methodology as analytic rather than prescriptive is comparatively recent. It probably originates with John F. Herschel (Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy. London, 1830)

^{৬৮} ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান: ইসলামে দর্শন চিন্তার পটভূমি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৫ সম্মুখে এবং পৃ. ১৯ সম্মুখে।

সূফী উদ্ধৃতি

- কুস্বভাবাপন্ন আলিম অপেক্ষা সুস্বভাবাপন্ন ফাসিকের সাহচর্য উত্তম।
- আল্লাহর নিয়ামত ও স্বীয় অপরাধের কথা চিন্তা করলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা-ই লজ্জা।
- স্বীয় ইখতিয়ারকে দূর করে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নিজেকে সোপর্দ করার নাম রোজা।
- তাওবার অবস্থা তিনটি। যথাঃ (১) আল্লাহর নিকট লজ্জিত হওয়া, (২) পাপ কাজ বর্জন করার দৃঢ় সঙ্কল্প করা, আর (৩) জুলুম ও ঝগড়া থেকে নিজেকে পাক রাখা।
- সত্যবাদীর নাম হল সততা। যে ব্যক্তিকে কথায়, কাজে সৎ দেখা যায়, সে-ই সিদ্দীক।

-হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)

শিশুদ্যলোক

সাবধানীরা থাকবে ঝরণা ভরা জান্নাতে

মো. তাজুল ইসলাম রাজু

বন্ধুরা,

তোমাদের সবাইকে ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা। কেমন আছো? বর্তমান সময়ে তোমাদের শিক্ষা জীবনে একদল নতুন বই, নতুন স্কুল, নতুন ক্লাস নিয়ে মহাআয়োজনে ব্যস্ত। অন্যদল সামনে মহাপরীক্ষা। এসএসসি সমমান দাখিল। তা নিয়ে আছো মহাব্যস্ত। সব মিলিয়ে স্ব স্ব অবস্থানে সকলে মহান সৃষ্টিকর্তার নিয়ামতের আন্জামে জীবন-মানকে সুন্দর এবং সার্থক করতে যে পথ, তা মসৃণ ও সহজ করতে এগিয়ে যাচ্ছে-তার জন্য শোকরিয়া আদায় করছি মহান প্রভুর দরবারে।

তোমাদের জন্য একটি মহান সু-খবর। সকলের প্রিয় পত্রিকা আলোকধারা ১৯৯৭ সাল থেকে শিশুদের জন্য এক বিশাল আয়োজন নিয়ে যাত্রা করেছিল। এই মহাযজ্ঞ ২০০৪ সালে এসে থেমে আছে। এবার নতুন আঙ্গিকে তোমাদের নিয়ে আলোকধারা আবার পথ চলা শুরু করলো। সে জন্য আলোকধারা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমরা আশা করছি এখন থেকে নিয়মিত তোমাদের সাথে নিয়ে আলোকধারা'র আলোকবর্তিকায় জীবন আলোকিত করার অপার সুযোগ পাবো।

আমাদের মনে রাখতে হবে। জীব আর কূলের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠতম। আর মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে আশিয়া-ই কিরাম। যারা তাঁদের অনুসরণ করে তারাই হয় শ্রেষ্ঠ উম্মত। নবী রাসূলগণ ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করে ধন্য হন। অতঃপর এই নির্ভুল জ্ঞানের আলোকে অপরাপর মানুষকে আলোকিত করার জন্য প্রয়াস পান।

পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আলাইহিস্ সালাম) ছিলেন একজন নবী। মহান আল্লাহ্ উনার মাধ্যমে একটি পরিবার, পরে একটি গোত্র এবং আরো পরে একটি গোত্রগুচ্ছ গড়ে তুলেছেন। উনার সন্তান-সন্ততি প্রজন্মের পর প্রজন্ম আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানানুসরণ করে পৃথিবীতে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু মানুষ ক্রমশ ইবলিসের প্ররোচনায় আপ্ত হয়ে পথভ্রষ্ট হতে থাকে। এই প্রসঙ্গে পবিত্র আল কুরআনের সূরা হিজর ২৬-৪৬ আয়াতের বঙ্গানুবাদ হচ্ছে- “আমি তো ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি। আর এর আগে খুব গরম বাতাসের ভাপ থেকে জিন সৃষ্টি করেছি। যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বললেন, আমি ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করেছি, যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তার মধ্যে আমার রুহ (প্রাণ) সঞ্চার করব, তখন তোমরা তাকে সিজদা করবে। তখন (আদমকে) ফিরিশ্তারা সকলেই সিজদা করল, ইবলিস ছাড়া। সে সিজদা করতে অস্বীকার করল। আল্লাহ্ বললেন, হে ইবলিস! তোমার কী হল যে, তুমি সিজদাকারীদের সাথে যোগ দিলে না? সে বলল, তুমি ছাঁচে-ঢালা শুকনো মাটি থেকে যে-মানুষ সৃষ্টি

করেছ আমি তাকে সেজদা করব না। আল্লাহ্ বললেন, তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, তুমি তো অভিশপ্ত। আর কর্মফল-দিবস পর্যন্ত তোমার ওপর অভিশাপ রইল। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও। আল্লাহ্ বললেন- তোমাকে অবকাশ দেওয়া হল, অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার যে-সর্বনাশ করলে তার দোহাই আমি পৃথিবীতে মানুষের কাছে (পাপকে) আকর্ষণীয় করব আর আমি সকলের সর্বনাশ করব। তোমার নির্বাচিত বান্দা ছাড়া।

আল্লাহ্ বললেন, এ-ই আমার কাছে পৌঁছানোর সরল পথ। বিভ্রান্ত হয়ে যারা তোমাকে অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনো প্রভাব খাটবে না। তোমার অনুসারীদের সকলেরই স্থান হবে জাহান্নামে। তার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে। সাবধানীরা থাকবে ঝরণা ভরা জান্নাতে। (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ওখানে প্রবেশ করো। এতে স্পষ্টভাবে বুঝা গেলো যারা সাবধান হবে তারা শান্তি ও নিরাপত্তা পাবে উভয় জগতে। এখন আমাদের সাবধানী হবার কৌশল কী তা জানতে চেষ্টা করবো-

এই পথভ্রষ্ট মানুষগুলোকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হযরত নূহ (আলাইহিস্ সালাম) কে রিসালাত দান করেন। এইভাবে সত্য দ্বীন এবং পথভ্রষ্টতার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। এবার আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আসলেন রহমতুল্লিল আলামিন হয়ে এই দুনিয়ায়।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো- যখন কোন নবী সত্য দ্বীনের পথে লোকদের ডাকতেন, তখন সত্য-সন্ধানী লোকেরা তো তাঁর ডাকে সাড়া দিতো। কিন্তু পথভ্রষ্টতার শেষ সীমায় ছিলো যাদের অবস্থান তারা সেই নবীর বিরোধিতায় নেমে পড়তো। পথভ্রষ্টরা ভিত্তিহীন কথা রচনা ও রটনা করে তাঁর ভাব মর্যাদা বিনষ্ট করার চেষ্টা চালাতে থাকলেও নবীদের জীবনে কোন ব্যর্থতা নেই। পবিত্র কুরআনের ভাষায় উনারা সাবধানী এবং আল্লাহ্‌র নির্বাচিত বান্দা।

এখন তোমাদের শৈশবের জীবন। শৈশব জীবন থেকে ভবিষ্যত জীবন সফল করতে হয়। তোমাদের শৈশব জীবন থেকেই শুরু করতে হবে, যে কোন বিষয়ে অপব্যখ্যা দ্বারা বিভ্রান্ত না হবার কৌশল, সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার অন্বেষণ ও অবলোকন এবং মহাসত্য অনুধাবন ও পর্যবেক্ষণে ব্রতী হবার চিন্তা চেতনা মনের ভিতর গেঁথে নিতে হবে। ‘জানতে পারলে মানা সহজ’ এ নীতি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা জানি-নবুয়ত পরিসমাপ্তির সু-শৃঙ্খল পন্থায় মানুষের মানবিক মূল্যবোধের কাঙ্ক্ষিত বিকাশের লক্ষ্যে মানুষের জীবনাচরণের প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ, অনুশীলন, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের জন্য দিক নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করে আসছেন আশিয়া কিরামের পরে অলি-আল্লাহ্‌গণ। তাই আমরা ইতিহাসে উনাদের মূল্যায়ন করতে দেখেছি কখনো সংস্কারক হিসেবে, কখনো করুণা ও সহনশীলতার মূর্তপ্রতীক রূপে। তেমনি এক মহান মূর্তপ্রতীক- হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ। আমরা

উনাকে ভক্তিভরে শ্রদ্ধাবনত হয়ে সম্বোধন করে বলি-
মতলুবুত্তালেবীন, জুবদাতুল আরেফীন, সুলতানুল
মোকাররবীন, কুতুবুসসামাওয়াতে ওয়াল আরদিন, নুরুল
আলম, গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ
আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী কাদাসাল্লাহু সিররাহু আজিজ।

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ১২৩৩ সনে পহেলা মাঘ রোজ
বুধবার দিবা দ্বি-প্রহরান্তে জোহরের সময় শিশু গাউসুল আযম
ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। এবার উনার শৈশব জীবন সম্পর্কে
জানবো। চার বছর চার মাস বয়সে তিনি আরবি ও বাংলা
শিক্ষা শুরু করেন। কোন সঙ্গী সাথী নেই। পরম করুণাময়
উনার সঙ্গী। নিয়মিত পাঠশালায় যেতেন। শিক্ষকদের
অনুসরণ ও অনুকরণ করতেন। পড়াশোনায় অবহেলা নেই।
পাঠশালার সাথীদের সাথে সম্প্রীতি ছাড়া বিবাদ বিদ্বেষ ও
অনাবশ্যিক কোন আলাপ নেই। গুরু ভক্তি ও পাঠে
মনোনিবেশই ছিল একান্ত স্বভাব। স্রষ্টার রহস্যতে প্রাকৃতিক
পটভূমি ছিল উনার পাঠ্যগ্রন্থ। ভাবতেন স্রষ্টার সৃজন, নিগূঢ়
রহস্য, চন্দ্র-সূর্য, তারা-গ্রহ কিভাবে পরিচালিত হয়? কে
তাদের পরিচালক? পশু পাখি কার জয় গান গায়? কারোই বা
তারা স্মরণ করে? তার সৃজন রহস্য কী? এই রহস্যের স্রষ্টার
প্রতি আমাদের কর্তব্য কী? এ প্রশ্নের তাৎপর্য সমাধানে সর্বদা
তিনি মত্ত থাকতেন।

সাত বছর বয়সে তিনি নামায পড়া শুরু করেন। তখন থেকে
মহাপ্রভুর ইবাদতে রত থাকতেন। লেখাপড়ায় তিনি প্রথম
স্থান অধিকার করতেন। তিনি লেখাপড়া ও আচার-আচরণে
গুরুজনদের স্নেহের পাত্র ছিলেন। তাঁর ভক্তি নম্রতা ও
একাত্মচিত্ততার গুণ সবাইকে মোহিত করতো। এভাবেই তিনি
সমগ্র জীবনের সূচীপত্র গঠন করে ১২৬৮ সালে কলিকাতা
আলীয়া মাদরাসার শেষ পরীক্ষায় অনন্য কৃতিত্বের সাথে
হাদিস, তফসির, ফিকাহ, মান্তিক, হিকমত, বালাগত, উসুল,
আকায়িদ, ফালসাফা ও ফরায়েজ সহ যাবতীয় শাস্ত্রে
অভিজ্ঞতা অর্জনপূর্বক আরবী, উর্দু, বাংলা ও ফার্সী ভাষায়
অশেষ পারদর্শীতা অর্জন করে পৃথিবীর মহান স্রষ্টার অনুকূলে
নিজেকে উৎসর্গ করতে থাকেন।

উনার একটি কেলামতের বর্ণনা- 'ত্রিপুরা জেলার চৌদ্দগ্রামের
হিঙ্গুলার আহমদ দায়েম চৌধুরীর পুত্র আবদুল হোসাইন
চৌধুরী ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় অত্যন্ত খারাপ
করেন এবং পাশের আশায় নিরাশ হয়ে হযরতের দরবারে
দোয়াপ্রার্থী হন। তিনি বলেন, আমি দরবার শরিফে হাজির
হয়ে হযরতকে কদমবুচি করে আরজ করলাম, হুজুর আমি
পরীক্ষায় সুবিধা করতে পারিনি। আমি গরিব ছাত্র। এইবার
পাশ করতে না পারলে আর পড়তে পারব না। এখন হুজুরের
দোয়া ছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর নেই। হযরত আমাকে
নাম, পিতার নাম, বাড়ীর কথা তিনবার করে জিজ্ঞাসা
করলেন। আমি যথারীতি উত্তর দিলাম। হযরত কিছুক্ষণ চক্ষু
মুদ্রিত অবস্থায় চুপ করে রইলেন। পরে বলে উঠলেন, মিঞা,
খোদা তোমাকে সব বিষয়ে পাশ করিয়ে দিয়েছেন। ভয়
নেই। চলে যাও।

তা শ্রবণে খুবই আনন্দিত হলাম। হযরতকে কদমবুচি করে
বিদায় হলাম। কিন্তু মনে শান্তি কিছুতেই আসেনা। পরীক্ষার

ফল বের হল। দেখলাম, আমি আল্লাহ্র রহমতে ও হযরতের
দোয়ার বদৌলতে পাশ করেছি। আমার পরীক্ষা পাশ তাঁর
দোয়া ও অসাধারণ কেলামত ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূত্র:
গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেলামত)।

এভাবে তিনি শিশু থেকে শুরু করে সকল সৃষ্টিরাজির কল্যাণে
মহাপ্রভুর গুণগান প্রচার করতে থাকেন এবং এক বাণীতে
বলেন- 'যে কেউ আমার সাহায্য প্রার্থনা করবে আমি তাকে
উনুক্ত সাহায্য করবো। আমার এ করুণাধারা হাসরতক্ জারি
থাকবে'। এমন আরো অসংখ্য বিষয় আছে যা ধাপে ধাপে
তোমাদের জানাতে চেষ্টা করবো।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জানুয়ারী, বাংলা ১৩১৩ সনে ১০ মাঘ,
১৩২৩ হিজরীর ২৭ জিলকদ তিনি নশ্বর পৃথিবী থেকে
করুণাময় আল্লাহুতায়ালার নূরী জাতে শুভ মিলনে ধন্য হন।
এ শুভ মিলন দিবসে লক্ষ-লক্ষ লোকের সমাবেশে বিভিন্ন স্থান
হতে ভক্ত জায়েরীনগণ নিজ নিজ কায়দায় প্রত্যেকে ধর্ম-কর্মে
রত থাকেন। এই দিবসকে স্মরণ করে মাইজভাণ্ডারী
একাডেমী আয়োজন করেছে শিশু কিশোর সমাবেশের। এবার
হযরতের ১১১তম উরস্ শরিফ আর শিশু সমাবেশ হচ্ছে
১০ম। এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন বিষয়ে
প্রতিযোগিতার। তোমরা নিশ্চয় সেখানে অংশগ্রহণ করবে।
সেটা সকলে প্রত্যাশা করে।

অভিভাবকদের জন্য বলতে হয়-বিজ্ঞানীর মতে, মানুষের
মনস্তাত্ত্বিক গঠনের দিক থেকে ১৩ বছর বয়স হচ্ছে
চিন্তাশক্তির নিষ্পন্নতা বা চিন্তাশক্তির ক্রমবিকাশের সময়
অর্থাৎ এ বয়সকালটি হচ্ছে সেই সময় যখন মানুষ কোনো
জিনিসের অনুপস্থিতিতে বা কোন জিনিসের অস্তিত্ব না থাকা
সত্ত্বেও তা কল্পনায় ধরে নিয়ে নানা চিন্তা-গবেষণা ও বিচার
বিশ্লেষণ করতে পারে। কিশোরকে বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদা অনুযায়ী
জ্ঞান দান পরিবেশ সৃষ্টি করলে তার মধ্যে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তৈরি
করা সম্ভব হবে এবং তা স্থায়িত্ব লাভ করবে। প্রকৃত জ্ঞানের
অভাবে যখন তার কথা, কাজ, আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা
সবকিছু ধর্মীয় হয়ে যাবে তখন সে এক আদর্শ মানবে পরিণত
হবে।

একজন কিশোরের মধ্যে যখন পুরোপুরিভাবে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব
গড়ে উঠে তখন তার মধ্যে একটি বিশেষ ধর্মীয় ও আত্মিক
শক্তির সৃষ্টি হয় যা স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মীয় উদ্দীপনা আকারে প্রকাশ
পায়। তখন তার মধ্যে ধর্মের প্রতি গভীর মুহব্বত জন্ম দিয়ে
ব্যাপকতরভাবে ধর্মীয় তৎপরতা শুরু করতে হবে। অতঃপর
একজন সাধারণ মানুষ নয় বরং সে একজন আন্তরিক দেশ
প্রেমিক ও সৎ, যোগ্য, নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে
যাবে। এরপর নিজের মধ্যে গভীর ধর্মীয় উদ্দীপনা ও
উচ্ছ্বাসের জন্ম নেবে। তার মধ্যে এক উন্নততর প্রেমের উদ্ভব
হবে, যা হচ্ছে মহান আল্লাহ্র প্রতি প্রেম। আর যখন
খোদাপ্রেমের স্তরে উপনীত হবে, অতঃপর খুব সহজে
প্রবৃত্তির তাড়নায় পরাভূত হবে না। পার্থিবতার দ্বারা আকৃষ্ট
হবে না। এমন সাবধানতার ফলে আমাদের পথচ্যুত হওয়ার
আশঙ্কাও থাকবে না।

সবাইকে ধন্যবাদ। আবার কথা হবে পরবর্তী সংখ্যায়।

রাষ্ট্রীয় সফরে মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী মিশরে

॥ অধ্যাপক এ.ওয়াই.এম.জাফর ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর-৪র্থ কিস্তি)

এতক্ষণ ধরে সচিব, উপ-সচিব এবং সৈয়দ আদিল মঞ্চের বিভিন্ন যন্ত্রের Placing, Light, Sound, Microphone নিয়ে মঞ্চ কুশলীদের ইংরেজীতে যতভাবে বোঝাতে চেষ্টাই করুক না কেন কাজ হচ্ছিল না। মিশরের আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. শেষ পর্বের ছাত্র বেলাল উদ্দিন চৌধুরী মঞ্চের উপস্থিত হয়ে আরবীতে সে সব বুঝিয়ে বলতেই বিশ মিনিটের মধ্যে তার সমাধান হয়ে গেল। এবার সৈয়দ আদিল মিশরের মঞ্চের একবার চূড়ান্ত টেস্টের অনুমতি চাইতে সচিব আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন- আদিল, আপনারা দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। দেশের মান উজ্জ্বল হবে আপনাদের এ সুফি গানে। সরকার আপনাদের মনোনীত করার সময় সে সব বিবেচনায় নিয়ে পাঠিয়েছে। আপনারা শুধু মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠীর হয়ে বা লালন শিল্পী হয়ে গান করবেন না দেশের হয়ে গান করবেন। শুভ কামনা। বললাম মুনিবকে স্মরণে রেখে, আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা নিয়ে দেশের হয়ে মাইজভাণ্ডারী প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিটি কালাম পরিবেশন করবেন। মনে রাখবেন মুনিব সহায়, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। লালন শিল্পীদেরও একই কথা বলে তাদেরকে মঞ্চের ছেড়ে দিয়ে আমরা উইংসের এ পাশে চলে আসলাম। তারা প্রতিটি কালামের মুখ ও শেষ অন্তরা ঝালিয়ে নিলো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। লালন শিল্পীদ্বয়ও তাই করে নিজেদের সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে নিল।

তখন মিশরের স্থানীয় সময় রাত ৯টা ২০ মিনিট। দেখলাম হল ভর্তি দর্শক যারা এতক্ষণ হলের মধ্যে ছিলেন মিশরের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ এমনকি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মিশরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, ফাস্ট সেক্রেটারী, এ্যাটাসে সহ সবাই হলের বাইরে চলে গেলেন। স্থানীয় সময় ঠিক সাড়ে ৯টা বাজতেই হলের মেইন গেট খুলে দেয়া হলো। সবাই মেটাল ডিটেকটিং গেট ক্রস করে প্রবেশ করছিলেন। প্রথমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতসহ মিশর সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দকে দেখলাম। দশ মিনিটের মধ্যে হল মোটামুটি ভর্তি হয়ে গেল। স্টেজ ম্যানেজার আমাদের সাথে কথা বলে, সব কিছু রেডি জেনে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার, লাইট প্লেনারকে ওয়াকীটকিতে নির্দেশ দিতেই মুহূর্তে মঞ্চের আলোর বন্যা বয়ে গেলো, মাইক্রোফোনগুলো সচল হয়ে গেল। হলের লাইট অফ হতেই আমরা মঞ্চের যে যার নির্ধারিত স্থানে দাঁড়িয়ে পড়লাম। জাতীয় সঙ্গীত বাদন শুরু হয়ে গেল। বিদেশের মাটিতে

জাতীয় সঙ্গীত মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান শুরুর প্রাক্কালে, সে যে কী দারুন অনুভূতি। মঞ্চের আমরা দাঁড়ানো। হল ভর্তি দর্শক দাঁড়ানো। কৃতজ্ঞতায়, শ্রদ্ধায় বুক ভরে গেল চোখ ছল ছল করে উঠল। এই জাতীয় সঙ্গীত, এই লাল সবুজের পতাকার জন্য ত্রিশ লক্ষ প্রাণ বলি দিয়েছি। দু'লক্ষ মা বোনের ইজ্জত বিসর্জন দিয়েছি-এই আমার দেশ। এ আমার গর্ব। এ সময় বার বার মুনিবের পবিত্র চেহারা মোবারক চোখে ভাসতে লাগলো।

জাতীয় সঙ্গীত শেষ হতেই 'বাংলাদেশ কালচারাল ডেলিগেটের টিম লিডার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদা আক্তার মিনা স্বাগত ভাষণে দেশ ও জাতির প্রেক্ষাপট বর্ণনা, বাংলাদেশ মিশর সম্পর্ক, দু'দেশের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ধারায় সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলাদেশ কালচারাল ডেলিগেটের ভূমিকা এবং শেষে অনুষ্ঠান উপভোগের জন্য সবাইকে স্বাগত জানিয়ে অনুষ্ঠান উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক হবার আশাবাদ ব্যক্ত করে সচিব তার বক্তব্য শেষ করেন। তারপরই বাংলাদেশ কালচারাল ডেলিগেটের ডেপুটি লিডার সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব, অনুষ্ঠানের সঞ্চালক পরিমল দাশ-ডেলিগেটের মিউজিক কো-অর্ডিনেটর, 'মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী'র সভাপতি হিসেবে আমাকে সুফি মিউজিকের ধারায় মাইজভাণ্ডারী গান ও লালন গীতি সম্পর্কে উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানালে-সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঁচ মিনিটের বক্তব্যে সুফি মিউজিক, লালন গীতি সম্পর্কে অবতারণা শেষে মাইজভাণ্ডারী গানের ব্যাখ্যায় বললাম- মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মসাম্য, মানব সাম্য, বিচার সাম্য ও সকল মানুষের সম অধিকারে, আত্মশুদ্ধিতে স্রষ্টাপ্রেমে বিশ্বাসী ও সম্পূর্ণ স্রষ্টা নির্ভর দর্শনের প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) আনন্দপ্রিয় বাঙালি জাতির জন্য নিষ্কলুষ স্রষ্টাপ্রেমী ভাববিভোর মাইজভাণ্ডারী গানকে পরোক্ষ অনুমোদন দিয়েছেন। মূলতঃ মাইজভাণ্ডারী গান, গান নয়-ইবাদত। মাইজভাণ্ডারী গান, গান নয় স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির মিনতি, মুর্শিদ চরণে ভক্তের আকুতি। মাইজভাণ্ডারী গানের প্রতিটি ছত্রে ইশকে হাকিকী তথা খোদাপ্রেম বিধৃত, সংগীতগুলো খোদা প্রেমে ঝংকৃত। অন্য সুফি লেখক দার্শনিকের মতো লালন শাহ নিজে লালন গীতিগুলো রচনা করেছেন বলে তা লালন গীতি। কিন্তু সে অর্থে মাইজভাণ্ডারী গান মাইজভাণ্ডারী গান নয়। মাইজভাণ্ডারী কোন পীর মুর্শিদ সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া

কোন গান রচনা করেননি বরঞ্চ তাঁদেরকে কেন্দ্র করে গানগুলো রচিত হয়েছে, হচ্ছে। দৃশ্যত মাইজভাণ্ডারী গানের কথা, সুর, তাল, লয় ভক্তজনের অন্তর মাঝে আল্লাহর অস্তিত্বের, মুর্শিদ উপস্থিতির অনুভূতি এনে দেয়। তখন নিবেদিত ভক্তজনের মাঝে এক ধরণের ভাব বিভোরতা সৃষ্টি হয়। মুদিত চোখে আন্দোলিত হয় তার শরীর, যা সুফিজনের কাছে অযদ বলে পরিচিত। আসলে মাইজভাণ্ডারী গান গান নয় ইবাদত, মাইজভাণ্ডারী গান উপলব্ধির উপভোগের নয়। আমার বক্তব্যের পর তা আরবীতে অনুবাদ করে মিশরবাসী তথা দর্শকদের অবহিত করে আমাদের মিশর প্রতিনিধি বেলাল উদ্দিন চৌধুরী।

তার পর পরই শুরু হয় মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠীর পরিবেশনা। মাইজভাণ্ডারী গানের আদি ও প্রথম গীতিকার মাওলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরীর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীকে কেন্দ্র করে লেখা -

‘দমে দমে জপরে মন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, ঘটে ঘটে আছে জারী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’ গান দিয়ে শুরু হয় তাদের যাত্রা।

তারপর বজলুল করিম মন্দাকিনীর ‘কে তুমি হে সখা আড়ালে থাকিয়া, হরিলে আমার প্রাণ-’ এর পর পর কবিয়াল রমেশ শীলের ‘মাইজভাণ্ডারে উঠেছে তৌহিদের নিশানা, ঘুমাইওনা মায়া ঘুমে আখের জমানা’ চলতে চলতে দর্শকের মাঝে বিভোরতা শুরু হয়।

এ অবস্থায় দর্শকপ্রিয়তা তুঙ্গে তুলে সঞ্চালক লালন গীতির শিল্পী কোহিনূর আক্তার গোলাপী ও সুমনকে মঞ্চ ছেড়ে দেন। প্রথমে গোলাপী তার পরিচিত ভঙ্গীতে ‘আল্লাহ্ বল মনরে পাখি’ ও সুমন তালুকদার গাইলো- ‘ধন্য ধন্য বলি তারে’ তার পরে দ্বৈত কণ্ঠে ‘মিলন হবে কত দিনে ও আমার মনের মানুষের সনে’র মাধ্যমে দর্শক মাতিয়ে সঞ্চালক পুনরায় মাইজভাণ্ডারী গানে ফিরে আসলেন। মরমীর শিল্পীরা এবার দ্রুত লয়ের রমেশ শীলের গান দিয়ে শুরু করলো তাদের পরিবেশনা ‘ওকী চমৎকার ভাণ্ডারে এক আজগুবী কারবার, ‘চিনতে পারিনা ভাণ্ডারী, চিনতে পারিনা’ ‘ইস্কুল খুইলাছেরে মওলা ইস্কুল খুইলাছে, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী ইস্কুল খুইলাছে। উৎফুল্ল দর্শক যখন আনন্দে, তৃপ্তিতে উদ্বেল সঞ্চালক পুনরায় লালন শিল্পীদের মঞ্চ নিয়ে আসলেন। কোহিনূর এবার গাইলো ‘হাওয়া দমে দ্যাখো তারে’ সুমন গাইলো-‘মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার’ কোহিনূর আবার গাইলো- ‘মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।’ সঞ্চালক তৃতীয়বার মাইজভাণ্ডারী গানে চলে আসলে মাইজভাণ্ডারী মরমী শিল্পীরা গাইলো-‘দয়াল ভাণ্ডারী মোরে তুরাইয়া লইও এবং শেষে মুনিবকে স্মরণে রেখে গাইলো ‘মওলা তুইরে তুই, আউয়ালে আখেরে মাওলা তুইরে তুই’। এ গান শেষ হতে হল ভর্তি

দর্শক নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে গেলো- নৈশব্দে ছেয়ে গেলো পুরো হল-ততক্ষণে শিল্পী কুশলী কর্মকর্তা আমরা সবাই দাঁড়িয়ে দর্শকদের বিদায়ী অভিবাদন ও মঞ্চ ত্যাগের অনুমতি চাইলাম এবং ফটোসেশনে মিলিত হলাম।

আমাদের পুরো অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময় ছিল এক ঘণ্টা, কখন তা পেরিয়ে দু’ঘণ্টার কাঁটা ছুঁয়েছে বলতে পারিনি। মঞ্চ থেকে নামতেই মিশর জাতীয় টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ, মিউজিক কো-অডিনেটর ও মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠীর সভাপতি হিসেবে আমার সাত মিনিটের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলেন, যা আরবীতে অনুবাদ করলো মিশরে মরমীর প্রতিনিধি বেলাল উদ্দিন চৌধুরী। সেদিন রাতে মিশরের জাতীয় টেলিভিশনে সাক্ষাৎকারটি প্রচারিত হয়। টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার প্রদানের পর পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, এ্যাটাসেদয়, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও মিশর সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, সচিব, উপসচিব এবং আমি মরমী শিল্পী, লালন শিল্পীদের পেছনে নিয়ে হল ত্যাগ করতে করতে অনুষ্ঠানের সফলতায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং বন্ধুপ্রতিম মিশরের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার কথা প্রকাশ করলেন। ওদিকে সামনে থেকে ক্যামেরার ফ্লাশের আলো আর ক্লিক ক্লিক শব্দের মধ্য দিয়ে আমরা হল ত্যাগ করে নির্ধারিত গাড়িতে উঠতে যাবো, সে সময় কায়রো টাওয়ারের তীব্র মিষ্টি আলো আমাদের ছুঁয়ে যেতে যেতে যেন বললো- তোমাদের প্রতি শুভ কামনা। ভালো থাকো। আবার এসো। আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হোন।

গাড়িতে উঠতেই দেখলাম সচিব সাহেব আনন্দে উদ্বেলিত। বললেন-জাফর সাহেব আদিলরা আর কোহিনূররা দারুণ ভালো করেছে। আসলে কী আমরা এত ভালো হবে ভাবিনি। সত্যিই দেশের মুখ উজ্জ্বল করলে। প্রগলভ কথার ফুলঝুরিতে কখন হোটেল চলে এসেছি খেয়াল করিনি। গাড়ি থেকে নামতে নামতে দেখলাম নীল নদকে সামনে নিয়ে হোটেল লাউঞ্জে সাজানো টেবিলে, বিভিন্ন নারী পুরুষের উপস্থিতি। সবার সামনে মুখরোচক সব খাবার, মৌ মৌ গন্ধ, জিহ্বে জল আসার মত। শুনেছি রমযানে আরব দেশগুলো সারারাত জাগে আর পূর্বাহ্ন পর্যন্ত ঘুমায়। রাত বারটা বেজে গেলেও আমাদের ডেলিগেটের খাওয়ার জন্য ডাইনিং তখনো খোলা। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা সবার। খাওয়াও হলো প্রচুর। এদের খাবারে রুটি, প্রচুর গ্রীল মিট, ক্রীম, সালাদ, আচার আর ফুটসের উপস্থিতি বেশি। কিন্তু আমার পক্ষে বেশী খাওয়া সম্ভব হলোনা। বার বার আদিল এসে দেখছিল আমি কোন ক্রীম, মিষ্টি জাতীয় খাওয়ার ও ফুটস বেশী খাচ্ছি কি না, আমার ছেলে আসিফ তাকে অনুরোধ করেছে।

মুর্শীদের খোঁজে

শেখ আবুল বসার

আম্বিয়াগণ মহান আল্লাহুতাআলার “হাদী” নামের মজহর বা (আবির্ভাব) ছিলেন ও আল্লাহু তাআলার হেদায়েতের কাজ তাদের দ্বারা সাধিত হয়েছে, তাঁরা সকলেই আল্লাহু তাআলার নবী ছিলেন, অতপর আমাদের শেষ নবী খাতামান নাবীঈন হযরত আহম্মদ মুজতবা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্তর্ধান ঘটায় পর তাঁর এলমে লাদুনীর অধিকারীগণ ওয়ারেসুননী হিসাবে মনোনয়ন লাভ করেন। এই জন্য রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল উলামাউ ওয়ারাসাতুল আন নাবী বেল ইলমে”। “উলামাগণ নবীদের ইলমের বা জ্ঞানের ওয়ারিশ”। (সূত্র: সিররুল আসরার” ১ পৃঃ কৃত গাউসে পাক রাঃ ১৯৯৩ ইং মুদ্রণ।) এভাবে বলা যায় হেদায়েতের কাজে যাঁরা নিয়োজিত তাঁরা নায়েবে নবী বা নবীর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে থাকেন। তাঁরাই আহলে বায়তের সিলসিলায় আউলিয়ায়ে কিরাম বা পীরে কামেল বা মুর্শীদে কামেল নাম ধারণ করে হেদায়েতের কাজ করে থাকেন। অতএব মুর্শীদে কামেলকে ভালবাসলে ঠিক রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালবাসার ন্যায় ভালবাসা হয়। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন ধন দৌলত অপেক্ষা অধিক ভালবাসতে হয়, একইরকম ভালবাসার দাবী রাখেন মুর্শীদে কামেলগণ মুরীদের কাছ থেকে, যদি তেমন আনুগত্য ও মুহব্বত রাখতে না পারা যায় তবে তেমন মুরীদকে প্রকৃত ও উপযুক্ত মুরীদ বলতে পারা যায় না। মহান আল্লাহু তাআলা কালামে পাকে বলেন, “আল্লাহু ইয়াজতাবী ইলাইহি মাইয়াশাউ ওয়া ইয়াহদী ইলাইহি মাই ইউনিব”। আল্লাহু যাকে ইচ্ছা তাকে দ্বীনের প্রতি আপন করে নেন এবং তিনি তার দিকে আসার পথ তাকেই দেখান যে তার দিকে রুজু হয় বা ইচ্ছা পোষণ করে। (সূরা গুরা ৪২ঃ১৩)। এখানে দেখা যায় সবকিছুর আগে আল্লাহুর রাস্তায় যে বান্দা আসতে চায় তাকেই আল্লাহু তাআলা পথ দেখান এবং আপন করে নেন। বুঝা যাচ্ছে, সর্বাত্মক বান্দাকেই ইচ্ছা জাগ্রত করতে হবে। আবার বায়াত হতে হলেও নিজের ইচ্ছায় নিজেকে নিয়ে অলি মুর্শীদের কাছে যেতে হবে। প্রকৃত অলী বা আহলে বাইতের সাথে সংযোগ স্থাপনকারীগণ নিজেকে গোপন রাখার ফলে সাধারণ মানুষ বুঝতে বা চিনতে পারে না, তাই বুঝে শুনে বায়াত হতে হয়। মুর্শীদের হাতে বায়াত হওয়ার অর্থ বিক্রি হওয়া, অতএব

বায়াত হওয়ার পর মনে রাখতে হবে যে আপনি মুর্শীদের কাছে বিক্রি হয়ে তাঁর গোলাম বা ভক্ত অথবা দাস এর খাতায় নাম লিখিয়েছেন। এর পর বাতেনী হিসাব মতে আপনার ধন দৌলত, বাড়ী দালান, সন্তান সন্ততিতে কোন অধিকার নেই, সকল কিছুই মুর্শীদের কাছে উৎসর্গিত হয়েছে। মুর্শীদের ভালবাসায় ভক্তি ও প্রেমে আপনার এমন অবস্থা হওয়া দরকার যেন আপনি তখন ভাব বিহবলভাবে বলতে পারেন “প্রাণ যদি চাও মুর্শীদ দিব তা তোমারে, প্রাণ চেয়েও প্রিয় যা চাও দিব তা সাদরে”। অবশ্যই মনে প্রাণে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর মত, যেমনি তিনি তাঁর পুত্র ধন নয়নের মনি হযরত ইসমাইল (আঃ)কে আল্লাহুর রাস্তায় কুরবানী দিয়েছিলেন।

দেখুন ভালবাসা মুহব্বত ও প্রেম করার শিক্ষাও মহান আল্লাহু তাআলা তাঁর কালামে পাকে এভাবে বলছেন, “কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি ইউহবিব কুমুল্লাহা”। আপনি বলুন হে মাহবুব, যদি তোমরা আল্লাহুকে ভাল বাসতে চাও, তবে আমার আনুগত্য বা তাবেদারী অথবা অনুসরণ কর, আল্লাহু তোমাদের ভালবাসবেন”। (সূরা আলে ইমরান ৩ঃ৩১)। এখানে আল্লাহুর মহান বাণী থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহু তাআলার পরিচয় বা চেনার একমাত্র মাধ্যম বা নিশানা হল রাসূলে দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আবার রাসূলে পাকে চিনা জানার একমাত্র ধারা বা পদ্ধতি হল আহলে বাইত বা উলিল আমর কে চিনা বা ভালবাসা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহু তাআলা কালামে পাকে বলেন, “ইয়া আইয়ু হাল্লাজিনা আমানু আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম”। হে তোমরা যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহুর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা হুকুম দানে সক্ষম তেমন নেতা বা ইমামের যোগ্য তাদের আনুগত্য কর বা তাদের আদেশ মান (সূরা নিসা ৪ঃ৫৯)। এই আয়াতে পাকে দেখা যায় যা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আল্লাহুর সাথে পরিচয়ের সম্পর্ক করার আগে রাসূলে পাকের সাথে সম্পর্ক করার জন্য, আবার রাসূলে পাকের সাথে পরিচয়ের আগে উলিল আমর এর পরিচয় বা মুহব্বত রাখার জন্য। এ আয়াতের সমর্থনে আল্লাহু তাআলা আরও বলেন, “ইয়া আইয়ু হাল্লাজিনা আমানুত্তা কুল্লাহা ওয়া কুনু মাআস সাদেকীন”। হে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহুকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের বা সাদেকীনদের সাথী হয়ে যাও। (সূরা তাওবা ৯ঃ ১১৯)।

এখন দেখতে হবে উলিল আমর এবং সাদেকীন কারা,

তাফসীরে রুহুল বয়ানে সাদেকীন এর অর্থ কামেল মুর্শীদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের অনুসরণ এবং আনুগত্যের বিনিময়ে আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহকে পাওয়া যেতে পারে। আলেম বা বিদ্যান অথবা জ্ঞানীর অর্থ আরবী বা ফার্সী ভাষা শিক্ষিত ব্যক্তি নয়। আমাদের ধর্মে এলেম বা বিদ্যা ও আলেম বা বিদ্বানের অর্থ ভিন্ন, যার ধর্মজ্ঞান ও আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞান আছে সেই আলেম। যে ব্যক্তি শরা শরীয়তের মাসআলা মাসায়িল অবগত হয়ে নিজের চরিত্র গঠন করে চরিত্রবান ও নিষ্ঠাবান হতে পেরেছে এবং রাসূলে পাকের বংশধরদের মুহব্বত করে ভালবাসতে পেরেছে সে ব্যক্তিই আলেম নামে পরিচিতি পায়। এ জন্যই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেম উলামাগণকে নবীর ওয়ারেশ বা উত্তরাধিকারী বলেছেন। কিন্তু আমাদের নবী নগদ ধন সম্পদ রেখে যাননি, তিনি রেখে গেছেন কেবল এলম বা জ্ঞান, আর আলেম উলামাগণ তাঁরই ওয়ারিশ বটে।

আমাদের নবীয়ে দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার কোন শিক্ষকের স্মরণাপন্ন হননি, তিনি ছিলেন আল্লাহর কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত। বিগত নবী রাসূলগণের শিক্ষক দুনিয়ার কোন সাধারণ মানব ছিলেন না, নবী রাসূলগণের শিক্ষক ছিলেন মহান আল্লাহ তাআলা। এ ধারা চলে আসছে প্রথম মানব বলে পরিচিত আল্লাহর খলিফা হযরত আদম (আঃ) থেকে, পর্যায়ক্রমে সকল নবী রাসূলের শিক্ষকই মহান আল্লাহ তাআলা। অবশ্য তাঁরা ছিলেন তাঁদের উম্মতগণের শিক্ষক বা মুর্শীদ বা পথ প্রদর্শক। এই জ্ঞানের ওয়ারিশই হয়ে থাকেন উলামা-ই কিরাম। তবে যে আলেম এইরকম এলমে মারিফাত হাসিল করেন নি কিংবা মারিফত ও তরীকতের মুনকের বা অবিশ্বাসী তারা নিশ্চয় নবীর ওয়ারিশ নন বরং নবীয়ে দোজাহানের বিরুদ্ধাচরণকারী। যে আলিমগণ জাহেরী, বাতেনী এবং নবী পরিবার বা আহলে বাইত এর সাথে সম্পর্ক রাখেন, তাঁদেরকেই প্রকৃত আলিম উলামা বলা যেতে পারে। যার প্রমাণ হিসাবে আল্লাহ তাআলা কালামে পাকে বলেন এভাবে, “কুল আসআলুকুম আলাইহি আজ্জরান ইল্লাল মাওয়াদাতা ফিল কুরবা”। হে মাহবুব! আপনি বলুন, আমি আমার এই দাওয়াতী কাজের বিনিময়ে কোন মজুরী বা বিনিময় ও পুরস্কার চাই না তবে আমার আত্মীয়দের মধ্যে ভালবাসা ও মুহব্বত থাকুক তাই একান্ত মনে চাই। (সূরা শূরা ৪২ঃ২৩)। কাদের জন্য এমন ঘোষণা দিয়েছেন মহান আল্লাহ তাআলা একটু খুঁজে দেখি তাঁর কালামে পাকে, দেখুন তার প্রমাণ, “ফিদ্বুনিয়া মারুফাও ওয়াত্তাবী ছাবীলা মান আনাবা ইলাইয়া”। পৃথিবীতে তাদের

জায়নামায কর্ণার

আল-কুরআন

আমি কোনো কিছু ইচ্ছা করলে সে বিষয়ে আমার কথা কেবল এটাই যে, আমি বলি ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়। (১৬:৪০)

আল-হাদিস

আল্লাহর দৃষ্টিতে সেটাই শ্রেষ্ঠ আমল বা সৎকর্ম যা অল্পমাত্রায় হলেও নিয়মিত করা হয়। (সহিহ বুখারি)

কবীরা গোনাহ

শির্ক করা, হত্যা বা খুন করা, জাদু করা, সালাতে শৈথিল্য করা। আসুন আমরা এসব ঘৃণ্য কাজ থেকে বিরত থাকি।

আমল

প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ রোজা পালন করা। এগুলোকে আইয়ামে বীজের রোজা বলা হয়। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী (কঃ) তাঁর অনুসারীদের এ রোজা পালনে তাগিদ দিয়েছেন।

মাসায়ালা

হারাম টাকা পয়সা ও ধন দৌলতের ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না।

সাথে সদ্ভাবে বা ভালভাবে বসবাস কর এবং তেমন লোকের পথ অনুসরণ কর যারা আমার প্রতি বিনীত বা অনুগত। (সূরা লোকমান ৩১ঃ ১৫)। এর সমর্থনে আল্লাহ আরও বলেন, “ইয়াওমা নাদউ কুল্লা উনাসিম বি ইমামিহীম”। স্মরণ কর, যেদিন আমি তাদের কওমের ইমাম সহ ডাকব (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ঃ৭১)। এখানে কালামে পাকের বাণীসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওলাদগণের বংশধরগণই একালের এবং পরকালের ইমাম বা নেতা হবেন। আমরা যদি এমন নেতাদের খুঁজে বের করে তাঁদের সাথে ভালবাসা মুহব্বত এবং ভক্তি রাখতে পারি তবে হয়তো নবীজীর উলামার ওয়ারিশও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

সোনালী অতীতের কুশলী নির্মাতা

হযরত জাফর ইবন মুহাম্মদ আল-সাদিক (রাঃ)

ইসলামের ইতিহাসে হযরত জাফর ইবন মুহাম্মদ আল সাদিক একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। আল্লাহ-ভীতি, রাসূল-প্রীতি, কুরআন ও হাদীসে গভীর জ্ঞান, ধর্মপরায়ণতা, সত্যবাদিতা, ইসলামী বিধানশাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং তুলনাবিহীন পরহেজগারিতা সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের সকল মুসলমানের কাছে তাঁকে একজন অতি সম্মানিত ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন পবিত্র মদীনায়, ৭০০ কিংবা মতান্তরে ৭০২ খৃষ্টাব্দে। আর দুনিয়া ছেড়ে গেছেন ৭৬৫ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তাঁর কাছাকাছি প্রজন্ম থেকে আজ পর্যন্ত যত মুসলমান আছেন বা ছিলেন সবাই তাঁর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করেন। ঈমানদার মুসলমানদের তিনি অতি আপন জন। তাঁর সম্মানিত বাবা ছিলেন মুহাম্মদ আল বাকীর আর মা ছিলেন উম্মে ফারওয়াহ বিনতে আল কাসিম। বাবার দিক থেকে তিনি ছিলেন হযরত আলী রাঃ এর বংশধর আর মায়ের দিক থেকে মুহাম্মদ ইবন আবু বকর-এর। আপন সন্তান না হয়েও মুহাম্মদ ইবন আবু বকর লালিত পালিত হয়েছিলেন হযরত আলী রাঃ এর কাছে। তিনি বলতেন, “মুহাম্মদ ইবন আবু বকর আমার সন্তান (অর্থাৎ সন্তানতুল্য)তবে সে জন্মগ্রহণ করেছে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাঃ এর বংশে।” হযরত জাফর আল-সাদিককে শিয়ারাও মান্য করে থাকে। তবে হানাফি ও মালিকী মাজহাবের অনুসারীদের কাছেও তিনি সমভাবে গ্রহণযোগ্য। জীবনের প্রথম ১৪ বছর তিনি তাঁর দাদা হযরত জয়নুল আবেদীন রাঃ এর সান্নিধ্যে কাটান। দাদার শিক্ষা ও চরিত্রের অপরিসীম প্রভাব ছিল তাঁর জীবনে। যুগের রাজনৈতিক কলুষতা থেকে তিনি সর্বদা মুক্ত থাকতেন এবং কোনো বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নিজেকে জড়িত করতেন না। দাদার মত তিনি নানার সান্নিধ্যেও পেয়েছিলেন। তাঁর নানা কাসিম ইবন মুহাম্মদ ইবন আবু বকর ছিলেন একজন প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ। মদীনা শরিফে তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তখন উমাইয়াদের ক্ষমতা ছিল তুঙ্গে। তখন মদীনা শরিফের লোকজনের মাঝে হাদিস শরিফ চর্চা ও পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রবল আগ্রহ বিরাজমান ছিল। ৩৪ কিংবা ৩৭ বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতা মুহাম্মদ ইবন আবু বকরের (রাঃ) পর ইমাম পদে বরিত হন। দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে তিনি এ ইমামতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বলতেন, ‘ইমামত নিজে নিজে গ্রহণ করার কোনো বিষয় নয়। তবে প্রত্যেক ইমামের একটি বিশেষ ইলম বা জ্ঞান আছে যা তাঁকে ইমামের পদ গ্রহণের যোগ্য করে তোলে। এ বিশেষ জ্ঞান হযরত রাসূলে করিম মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হযরত আলী রাঃ এর মাধ্যমে নিকটতম প্রজন্মের মধ্যে ক্রমশ স্থানান্তরিত হয়।’ তাঁর জীবদ্দশায় মুসলিম বিশ্বে নানা রাজনৈতিক বিদ্রোহ বিপ্লব সংঘটিত হয়। একসময়

উমাইয়া খিলাফতের অবসান হয়ে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু তিনি কখনো কোনো প্রকার রাজনৈতিক বিরোধ বিসম্বাদে নিজেকে জড়িত করেন নি। তিনি বলতেন, আমি সমগ্র মুসলিম উম্মাহর স্বীকৃত ও সত্যিকারের ইমাম বা নেতা কিন্তু খিলাফতের দাবিদার নই। একবার খোরাসানী নেতা আবু মুসলিম উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে তাঁকে সাহায্য করার জন্য ইমামকে পত্র লিখেন। তিনি একটি বাতি জ্বালিয়ে আবু মুসলিমের পত্র পুড়িয়ে ফেলেন এবং পত্র বাহককে বলেন, ‘তুমি যা দেখেছ, তা হুবহু তোমার মনিবের কাছে বর্ণনা করো।’ তিনি আরো বলেন, ‘এ মানুষটি আমার নয়, এ সময়ও আমার সময় নয়।’ ইমাম জাফর আল-সাদিক স্বাধীনভাবে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার করতেন। মদীনা শরিফে তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৪ হাজারের মত। তন্মধ্যে হযরত আবু হানিফা ও হযরত আনাস বিন মালিকও ছিলেন। পরবর্তীতে এঁরা দু’জন মুসলমানদের জন্য বিখ্যাত হানাফি ও মালিকি মাজহাবের প্রবর্তন করেন। মুতা’যিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভাবক ওয়াসিল বিন আতা-ও তাঁর ছাত্র ছিলেন। সমসাময়িক জ্ঞানী গুণী ও সাধারণ ধর্মপরায়ণ মুসলমানদের মধ্যে তাঁর অসংখ্য অনুসারী ছিল। যদিও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি তিনি দ্রুক্ষেপ করতেন না তথাপি ক্ষমতাসীন লোকেরা জনসাধারণের ওপর তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তিকে ভয়ের চোখে দেখতেন ও একপ্রকার ঈর্ষা পোষণ করতেন। ইমামের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতাকে তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব ও ক্ষমতার প্রতি হুমকি মনে করতেন। ইমামতের পদটি একটি আধ্যাত্মিক পদ এবং পূর্ববর্তী ইমামই পরবর্তী ইমাম নিযুক্ত করার অধিকার রাখেন। শিয়ারদের মধ্যে প্রচলিত এ বিশ্বাসও রাজনৈতিক নেতাদের জন্য আতঙ্কের বিষয় ছিল। এজন্য আব্বাসীয়দের রাজত্বের শেষ দিকে ইমাম হযরানির শিকার হন। মদীনার গভর্ণর খলিফা আল মনসুরের নির্দেশে তাঁর বসতঘরে আগুন লাগিয়ে দেন, কিন্তু এতে তাঁর কোনো ক্ষতি হয়নি। অনুসারীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য তাঁর প্রতি সার্বক্ষণিক নজরদারি করা হত। তাঁর অনেক উক্তি ও শিক্ষা মুসলিম সুফিবাদের ভিত্তি রচনা করেছে। ইবনে খালদুনের মতে, তাঁর কিতাব আল জা’ফর গ্রন্থটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অনেক গুণ্ড রহস্যের ব্যাখ্যা দান করেছে। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত উক্তি: ১. নির্লোভ মানুষই সবচেয়ে ধনী। ২. ঐ সকল ধর্মীয় পণ্ডিতরাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকারের প্রতিনিধি যারা ক্ষমতাসীনদের দুয়ারে ধর্ণা দেয় না। ৩. নীরবতার চেয়ে উত্তম জিনিস আর নেই, অজ্ঞতার চেয়ে বড় শত্রু নেই, মিথ্যা বলার চেয়ে ভয়াবহ কোনো রোগ নেই। ৪. নিশ্চয়ই ঈর্ষা ঈমানকে খেয়ে ফেলে যেভাবে আগুন পুড়িয়ে ফেলে কাঠকে। ৫. তিনটি জিনিষ ভালোবাসা যোগায়: ধার্মিকতা, বিনয় ও বদান্যতা আর তিনটি জিনিষ যোগায় ঘৃণা: কপটতা, আত্মপ্রশংসা ও নির্যাতন।

আলোকধারা তথ্যভাণ্ডার

হিজামা: এক অনবদ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা
হিজামা এমন এক চিকিৎসা ব্যবস্থা যার সাহায্যে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন, রক্তসঞ্চালনজনিত সমস্যা, বিভিন্ন ধরনের ব্যথা, বন্ধ্যাত্ব, ইনফেকশন, ডায়াবেটিসসহ নানা জটিল রোগের চিকিৎসা করা যায়। এ ব্যবস্থায় প্রিয় নবী হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাইগ্রেন, পায়ের ও পিঠের ব্যথায় নিরাময় লাভ করেছিলেন। ‘হিজামা’ আরবি শব্দ। এর অর্থ ‘টেনে নেয়া’। শরীরের বিভিন্ন নির্দিষ্ট অংশ থেকে জমাট বাঁধা রক্তকে ছোট্ট বায়ুশূন্য কাপ দিয়ে বের করে নেয়া হয় বলে একে ‘টেনে নেয়া’ বা হিজামা বলা হয়। শবে মেরাজে উর্ধ্বাকাশে হযরত জিবরাঈল আঃ রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন: হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার উম্মতদের অসুস্থতায় হিজামা চিকিৎসা নিতে বলুন (তিরমিজি)। হিজামা চিকিৎসায় ছোট একটা সূঁচ দিয়ে ছোট ফোঁড় করে গরম কাপ চাপ দিয়ে উপুড় করে বসানো হয়। এতে কাপের ভেতরে বায়ুশূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং জমাটবাঁধা রক্ত স্বাভাবিক নিয়মে বেরিয়ে কাপে জমা হয়। আর এ রক্ত বেরিয়ে যাওয়ায় ব্যথা উপশম হয়। চীনে বহুল প্রচলিত ‘আকুপাংচার’ চিকিৎসা পদ্ধতি হিজামারই চৈনিক সংস্করণ। পাশ্চাত্যে এটাকে ‘কাপিং’ বলা হয়। মাসের নির্দিষ্ট তারিখে ও সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে এ চিকিৎসা নিতে হয়। সাধারণত চান্দ্র মাসের বিজোড় তারিখে যেমন ১৭, ১৯, ২১ ইত্যাদিতে হতে হয়। আবার এ তারিখগুলো সপ্তাহের সোম, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার পড়তে হয়। আমাদের রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুক্র, শনি, রোববার এবং খুবই জোর দিয়ে বলেছেন- বুধবারে এ চিকিৎসা নেয়া যাবে না।

সম্প্রসারণশীল বিশ্ব

মহাবিশ্ব ক্রমশঃ সম্প্রসারণমান। একথা আজ বৈজ্ঞানিক প্রমাণিত সত্য। আল্লাহ মানুষকে তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে বলেছেন। মানুষ যদি গবেষণার দৃষ্টিতে গভীর পর্যবেক্ষণ করে তাহলে সে প্রকৃতির বিপুল ও সুশৃঙ্খল আয়োজন দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়বে। পবিত্র কুরআন মানুষকে আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তাভাবনার জন্য সবসময় উৎসাহ যুগিয়েছে। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, ‘সৃষ্টির রহস্য নিয়ে কিছু সময় চিন্তাভাবনা করা সারারাত নফল ইবাদত থেকেও উত্তম।’ সুরা আজজারিয়ার ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে: ‘আমি নভোমন্ডলকে নিজ ক্ষমতাবলে সৃষ্টি করেছি এবং আমি মহাসম্প্রসারণকারী।’ মহাবিশ্বে অসংখ্য ছায়াপথ রয়েছে যেগুলোর আকার বিশাল। মাত্র ১০ শতাংশ মহাবিশ্বে ছায়াপথের সংখ্যা ২ ট্রিলিয়ন। এ ছায়াপথগুলো প্রতি সেকেন্ডে ৭০ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ১০ লাখ আলোকবর্ষ দূরের ছায়াপথ প্রতি সেকেন্ডে

২২.৪ কিলোমিটার বেগে ও ২০ লাখ আলোকবর্ষ দূরের ছায়াপথগুলো প্রতি সেকেন্ডে ৪৪.৮ কিলোমিটার গতিতে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। বড় ধরনের ছায়াপথগুলোর আড়াআড়ি দূরত্ব ১০ লাখ আলোকবর্ষেরও বেশি। বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের ১০ ভাগ অংশের ছায়াপথ নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন। বাকী ৯০ শতাংশ সম্পর্কে কোনো ধারণা করা এখনোও সম্ভব হয়নি। মহাবিশ্বের মাত্র ১০ লাখ ভাগের একভাগ জুড়ে এ ছায়াপথগুলো বিস্তৃত। তাহলে মহাবিশ্ব কত বিশাল তা মানুষ কল্পনা করতেও অক্ষম। হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নস্তরের একটি জান্নাতও ১০টি পৃথিবীর সমান।

পরমাণু অস্ত্রের মজুদ ও ধ্বংস সাধন ক্ষমতা

পৃথিবীতে বর্তমানে ১৫ হাজার ৪০০টি পরমাণু অস্ত্র মজুদ রয়েছে। এ তথ্য আর্ম কন্ট্রোল এসোসিয়েশনের। এ অস্ত্রের বেশির ভাগ মজুদ রয়েছে মাত্র দু’টি দেশের হাতে (৯৩ শতাংশ)। আর সে দেশ দু’টি হচ্ছে আমেরিকা ও রাশিয়া। এর মধ্যে ১০ হাজার অস্ত্র কার্য উপযোগী অবস্থায় সেনাবাহিনীর কাছে আছে। বাকীগুলো ধ্বংস করার অপেক্ষায় আছে। আমেরিকা ও রাশিয়া ছাড়া পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হচ্ছে চীন, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য। এছাড়া পরমাণু অস্ত্র রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, ইসরাইল ও উত্তর কোরিয়ার। তবে তাদের অস্ত্রের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। তা সত্ত্বেও একা ইসরাইলের হাতে ২০০টিরও বেশি পরমাণু অস্ত্র আছে বলে ধারণা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার যে পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে সেসবের ধ্বংস ক্ষমতা ৬ হাজার ৬০০ মেগাটন। যুক্তরাষ্ট্রের হাতে যে বৃহৎ বোমাটি রয়েছে তার নাম-বি-৮৩। এটা প্রথম ২৪ ঘন্টায় ১৪ লাখ মানুষ হত্যার ক্ষমতা রাখে। সাথে এর বিকিরণে ৩৭ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটি বিকিরণ ছড়াতে পারে ১৩ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে। রাশিয়ার সর্ববৃহৎ পারমাণবিক অস্ত্রের নাম ইউএসএসআর। এটি সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী নিউইয়র্কে আঘাত হানার ক্ষমতা রাখে। ধারণা করা হয় এটি ৭৬ লাখ মানুষ হত্যা করতে পারে। পাশাপাশি আহত করতে পারে ৪২ লাখেরও বেশি মানুষকে। আর এটি বিকিরণ ছড়াবে ৭ হাজার ৮৮০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে।

অনাহারে মৃত্যুর অপেক্ষায়

বিশ্ব এখন ২০১৭ সাল পালন করছে। কিন্তু আফ্রিকায় অনাহারে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে আছে ৩ কোটি ৭০ লাখ মানুষ। প্রচণ্ড খরার কবলে পড়ে সেখানে ৩ বছর ধরে খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে না। ২০১০-১১ সালে সেখানে অনাহারে মৃত্যু হয়েছিল ২ লাখ ৬০ হাজার মানুষের। ২০১৭ সালের পরিস্থিতি তার চেয়েও ভয়াবহ।



শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

১. মাদ্রাসা-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
২. উম্মুল আশেকীন মুনওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হিফযখানা, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
৩. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী ইসলামিক ইনস্টিটিউট (দাখিল), পশ্চিম গোমদভী ৯নং ওয়ার্ড, বোয়ালখালী পৌরসভা, চট্টগ্রাম।
৪. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) স্কুল, শান্তিরদ্বীপ, গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
৫. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, হামজারবাগ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম।
৬. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ইসলামি একাডেমি, হাইদগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৭. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া ও নূরানী মাদ্রাসা, সুয়াবিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৮. বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা, হাটপুকুরিয়া, বটতলী বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।
৯. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হিফযখানা ও এতিমখানা, মনোহরদী, নরসিংদী।
১০. জিয়াউল কুরআন নূরানী একাডেমি, পূর্ব লালানগর, ছোট দারোগার হাট, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
১১. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, সৈয়দ কোম্পানী সড়ক, ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১২. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৩. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী, বৈদ্যেরহাট, ভুজপুর, চট্টগ্রাম।
১৪. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৫. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

১৬. জিয়াউল কুরআন ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও ইবাদাতখানা, চরখিজিরপুর (ট্যাক্সঘর), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৭. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, মেহেরআটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৮. জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, এয়াকবুদভী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৯. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, চন্দনাইশ (সদর), চট্টগ্রাম।
২০. হক ভাণ্ডারী নূরানী মাদ্রাসা, নূর আলী মিয়া হাট, ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২১. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরিফ ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
২২. মাইজভাণ্ডার শরিফ গণপাঠাগার।

শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প:

- ◆ শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি তহবিল

দাতব্য চিকিৎসাসেবা প্রকল্প:

- ◆ হোসাইনী ক্লিনিক (মাইজভাণ্ডার শরিফ)।

দরিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প:

- ◆ যাকাত তহবিল।
- ◆ দুস্থ সাহায্য তহবিল।

মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প:

- ◆ মাইজভাণ্ডারী একাডেমি।
- ◆ মাসিক আলোকধারা।

আত্মোন্নয়নমূলক যুব সংগঠন : তাজকিয়া।

সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প:

- ◆ মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী।
- ◆ মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন।

জনসেবা প্রকল্প:

- ◆ দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী, মুরাদপুর মোড়, চট্টগ্রাম।
- ◆ দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী ও ইবাদাতখানা, নাজিরহাট তেমুহনী রাস্তার মাথা।
- ◆ দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী, শান-ই-আহমদিয়া গেইট সংলগ্ন, মাইজভাণ্ডার শরিফ।
- ◆ ন্যাযমূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরিফ)।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত অধ্যাত্ম সাধক ও বাংলাদেশে প্রবর্তিত তুরিকা, তুরিকা-ই-মাইজভাণ্ডারীয়া'র প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর ১১১তম উরস্ শরিফ উপলক্ষে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট (SZHM Trust)-এর উদ্যোগে

১০ দিনব্যাপী কর্মসূচি

তারিখ ও বার	অনুষ্ঠান	ব্যবস্থাপনায়
৩০ পৌষ ১৩ জানুয়ারি শুক্রবার	১০ম শিশু-কিশোর সমাবেশ ভেন্যু: নগরীর নাসিরাবাদ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়। সকাল ৯টা।	মাইজভাণ্ডারী একাডেমি
১ মাঘ ১৪ জানুয়ারি শনিবার	১৫ পর্বে যাকাত বিতরণ কর্মসূচি। ভেন্যু: চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তন। সকাল ১০টা।	যাকাত তহবিল পরিচালনা পর্ষদ
	সেমিনার: সুফিবাদ ও বর্তমান সমাজ। ভেন্যু: চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তন। বিকাল ৪টা।	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
২ মাঘ ১৫ জানুয়ারি রবিবার	২০১৬ পর্বে মেধাবৃত্তি প্রাপ্তদের মাঝে বৃত্তির অর্থ প্রদান অনুষ্ঠান। ভেন্যু: এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট মিলনায়তন, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম। সকাল ১১টা।	বৃত্তি তহবিল পরিচালনা পর্ষদ
৩ মাঘ ১৬ জানুয়ারি সোমবার	আন্তঃ ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মিলন - ভেন্যু: থিয়েটার ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম। বিষয়: অসাম্প্রদায়িকতা একটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা।	মাইজভাণ্ডারী একাডেমি
৪ মাঘ ১৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার	উলামা সমাবেশ। ভেন্যু: থিয়েটার ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম। বিকাল ৪টা। বিষয়: ইসলামে উগ্রবাদী ও জঙ্গিবাদী তৎপরতা নির্মূলে আলেমদের ভূমিকা।	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
৫ মাঘ ১৮ জানুয়ারি বুধবার	মহিলা মাহফিল বিষয়: ইসলামের দৃষ্টিতে আধুনিক সংস্কৃতি : গ্রহণীয় ও বর্জনীয়। ভেন্যু: এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট মিলনায়তন, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম। বিকাল ৩টা	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
৬ মাঘ ১৯ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার	শিক্ষক সমাবেশ - ভেন্যু: মাইজভাণ্ডার শরিফ। সকাল ১১টা। বিষয়: সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিরসনে শিক্ষকদের করণীয়।	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
৭ মাঘ ২০ জানুয়ারি শুক্রবার	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পর্ষদ নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা কমিটি সমূহের ব্যবস্থাপনায় স্ব স্ব এলাকার মসজিদে কুরআন তেলাওয়াত ও মিলাদ মাহফিল।	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ
৮ মাঘ ২১ জানুয়ারি শনিবার	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র- ছাত্রীদের র্যালী ও আলোচনা। সকাল ৯টা।	সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ
৯ মাঘ ২২ জানুয়ারি রবিবার	ফটিকছড়ি উপজেলার রেজিস্টার্ড এতিমখানাসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের একবেলা খাবার সরবরাহ।	গাউসিয়া হক মন্ডল
১০ মাঘ ২৩ জানুয়ারি সোমবার	জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ, ইসলামের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্বলিত দুর্লভ চিত্র ও ভিডিও প্রদর্শনী, উপদেশমূলক, দিক-নির্দেশনা সম্বলিত প্রচার, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, অস্থায়ী টয়লেটের ব্যবস্থা।	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
১১মাঘ ২৪ জানুয়ারি মঙ্গলবার	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর্মসূচি: প্রধান সড়ক হতে হযরত সাহেব কেবলার পুকুর পাড়। সকাল ৭টা।	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট ও গাউসিয়া হক মন্ডল



শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট
(SZHM Trust)

www.sufimaizbhandari.org